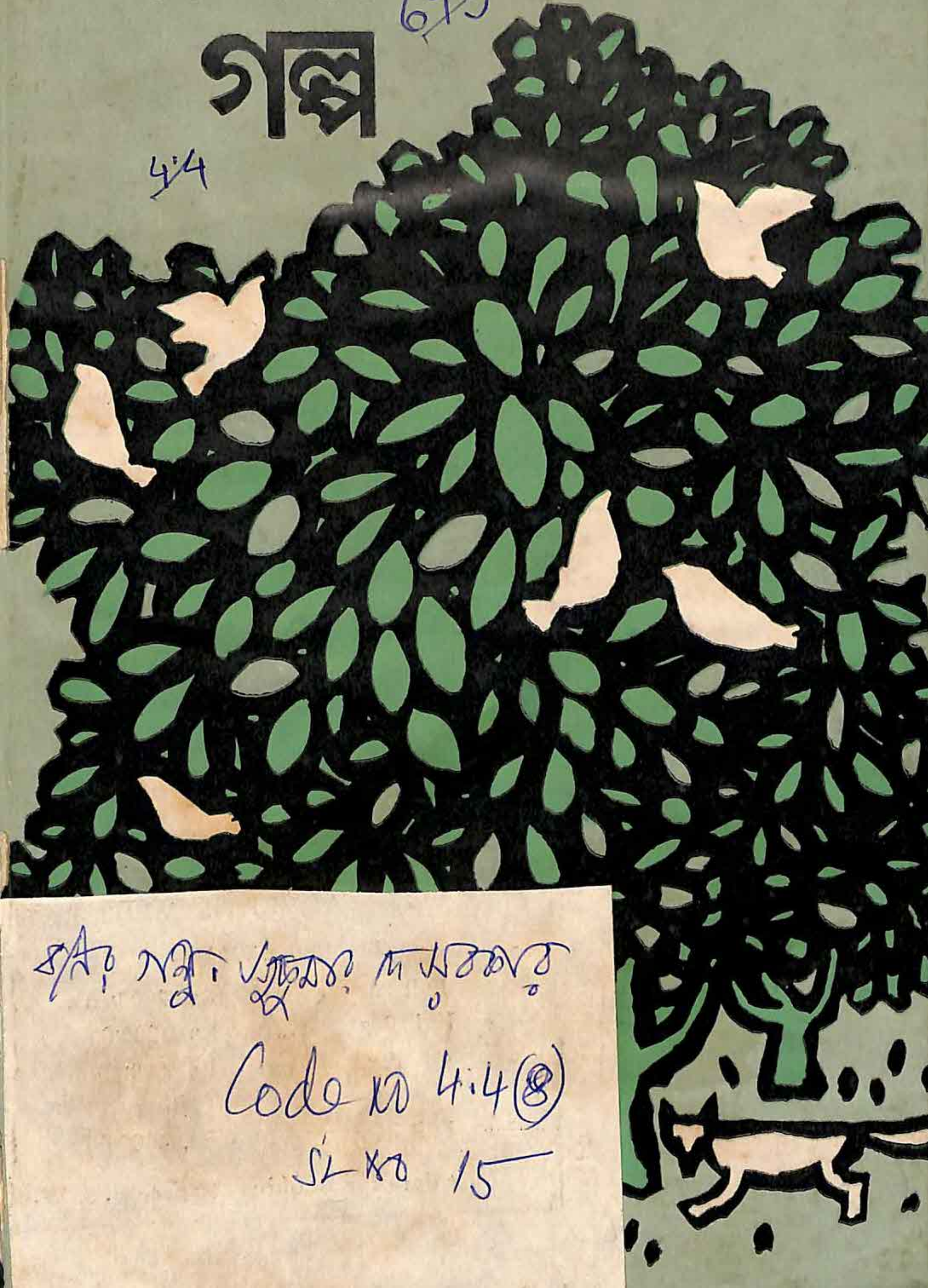
বনের গল্প

সুকুমার দে সরকার



বনের গল্প

সুকুমার দে সরকার



শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

শৈব্যা সংস্করণ ১৯৮৩

প্রকাশ করেছেন
রবীন বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

ছেপেছেন
শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ছবি এঁকেছেন
দেবাশীষ দেব

মূল্য ঃ আট টাকা

গল্প পড়তে আর শুনতে যারা

ভালবাসে তাদের হাতে

ছোটদের জন্যে দুরকমে লেখা হয়। কখনো কখনো লেখক শিশুদের জন্যেই একান্ত করে লিখতে চেষ্টা করেন—সে লেখায় কিছু অনুগ্রহ আর অনুকম্পা মেশানো থাকে। আর কেউ কেউ লেখেন নিজের আনন্দে, তাঁদের স্বাভাবিক তারুণ্য সহজ আলোর মতো শিশু কিশোরের মনকে স্পর্শ করে—বড়দের কাছেও সাহিত্যিক মহিমায় তা সমাদরের যোগ্য হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে যাঁরা ছোটদের জন্যে সেরা বইগুলি লিখেছেন তাঁরা এই দ্বিতীয় দলের। শ্রীযুক্ত সুকুমার দে সরকারও এঁদের একজন।

আশ্চর্য গল্প লেখেন সুকুমারবাবু। সে গল্প যেমন সুন্দর, তেমনি গভীর। তাঁর কলম তুলির মতো চলে—রঙে রেখায় ছবির পরে ছবি ফোটায়। ছোটদের মনে তা দোলা লাগায়—বড়দের কাছে তার আকর্ষণ অসামান্য।

আমাদের ভারতবর্ষের অপরূপ রহস্যময় বনভূমি আর তার পশু-পাখিদের নিয়ে 'বনের গল্প' পরিবেশন করেছেন সুকুমারবাবু। এসব গল্পে শিকারের বীভৎসতা নেই—রক্তপাতের হিংস্র উল্লাসও নেই। লেখকের প্রকৃতিকে দেখবার অপূর্ব দৃষ্টি, বনের প্রতিটি জীবজন্তুকে—তাদের সুখ-দুঃখ আশা ভয়কে অনুভব করবার সহৃদয়তা, অসামান্য অভিজ্ঞতা এবং ছবি-আঁকা কলমের জাদু এই গল্পগুলিকে কেবল শিশু-সাহিত্যেরই নয়, সমস্ত বাংলা সাহিত্যেরই সম্পদ করে তুলেছে। এই বই না পড়া ছোটদের ক্ষতি, বড়দের দুর্ভাগ্য।

সুকুমারবাবু লেখেন গল্প। কিন্তু যা লেখেন তা খাঁটি জিনিস। আইরিশ লেখক লিয়াম ও'ফ্লাহার্টি এই ধরনের গল্প লিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী—সুকুমারবাবুর শক্তি তাঁর চাইতে কম নয়। অথচ শুনেছি বাংলা দেশে তাঁর পরিচয় নাকি সীমাবদ্ধ। একথা বাঙালির পক্ষে গৌরবের নয়।

'বনের গল্প' আমাদের সাহিত্যের ঐশ্বর্য—এই কথাটি বলতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বনের গল্প

পানকৌড়ি

পানকৌড়ি পাখা মেলে কোথায় চলে যায়,
কাজল পরা গাঁয়ের মেয়ে অবাক চোখে চায়।

পানকৌড়িরা পাখা মেলে কোথায় চলে যায় কেউ জানে না। পুরোনো, নিঃসম্বল, কালো-বৌ জলার কাজল-কালো জলের ওপর যখন বেদনার্ত রক্তমাখা সন্ধ্যা নেমে আসে, যখন গাঁয়ের ভেতর থেকে প্রথম উদাস শঙ্খধ্বনি কালো-বৌ জলার জলে লুটিয়ে লুটিয়ে যায় তখন জলের ওপর থেকে অদ্ভুত হু-উ-ট্ একটা শব্দ করে পানকৌড়ির দল আকাশে ওঠে, তারপরে পশ্চিমের রঙিন বিবর্ণমান কোল ঘেঁসে অদ্ভুত সারে পানকৌড়ির দল আকাশ বেয়ে শাঁই শাঁই করে উড়ে চলে যায়। দূরে—বহু দূরে কালো একটা আঁকাবাঁকা রেখা হতে হতে এতটুকু একটা বিন্দু হয়ে দিকচক্রবালে মিলিয়ে যায় তারা।

পানকৌড়িরা কোথা থেকে আসে কোথায় যায়, কেউ জানে না। সন্ধ্যার আলো-আঁধারি আবছায়ায় কাজল-পরা গাঁয়ের মেয়েরা পাখার শব্দে আকাশ পানে চোখ তুলে বলে ওঠে—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো সে
মোর শাশুড়ি বলে গেছে বেগুন কোট সে।

সেইসব ছোট্ট মেয়েদের ভাবী শাশুড়িরা, এখনও যারা ঘরের কলা বৌ—তারা তখন আঁচলে প্রদীপটি ঘিরে তুলসীতলায় প্রণাম করছে। ঠিক সেই সময়টাতে রূপসি নদীর পাড়ের শিবমন্দির থেকে গুরুগম্ভীর কাঁসরের ঝঙ্কৃত নাদ ভেসে এসে সারা গ্রামময় ছড়িয়ে যায়।

পানকৌড়িরা তেমনি সার বেঁধে আবার ভোরের সঙ্গে সঙ্গে কালো-বৌ জলায় ফিরে আসে, আবার জলার স্থির জল তাদের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে। জলে অবলীলাক্রমে তারা ভাসে,

মুহূর্তের মধ্যে টুপ করে জলের তলায় তারা মিলিয়ে যায়। গাঁয়ের লোক বলে, ওই জলার নিচে গাঁয়ের এক কালো-বৌ মিলিয়ে গিয়ে তার জীবনের সব জ্বালা জুড়িয়েছিল, এখনও পানকৌড়িরা সেখানে তাকে খুঁজে খুঁজে ফেরে। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়, আমি জানি পানকৌড়িরা মাছ ধরে অমনি করে। যখন আবার জলের তলা থেকে সাপের মত মাথাটা শুধু তাদের ভেসে ওঠে, তাই দেখে এমন হাসি পায় বলবার নয়। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত তাদের মাথাগুলো টুপটাপ করে এদিক ওদিক নড়ে,—সে ভারি মজার দেখতে।

সেদিন ভোরবেলা পানকৌড়িদের প্রথম সার জলায় নেমেছে কিছুক্ষণ, এমন সময় আর-একটা সার ডানার গতি থামিয়ে ঝুপঝাপ জলে নেমে পড়ল। সারের শেষে একটা মোটাসোটা পানকৌড়ি-গিন্নি জলে নামবার আগে আকাশে মুখ তুলে হাঁক দিল—কক্ কক্ কুক্!

প্রথম সারের দল তখন জলার জলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। পদ্মনালের প্রকাণ্ড থালার মত পাতাটার পাশ থেকে টুপ করে মাথা বার করে একটা দিব্যি মোটা-সোটা পানকৌড়ি-গিন্নি জিজ্ঞেস করল—কি গো শঙ্খর মা, আজ যে এত দেরি?

প্রথম পানকৌড়ি-গিন্নি অর্থাৎ শঙ্খর মা জবাব দিল—আর বল কেন ভাই! দুরন্ত ছেলেটার জ্বালায় কোনদিক যে সামলাই ভেবে পাই না।

ছেলে কোথায় গেল?

কী জানি ভাই। মহা দুরন্ত ছেলে, খালি খালি দল থেকে ছিটকে কোথায় যে চলে যাবে কিছু ঠিকানা নেই! আর ডানায় এখন এমন জোর হয়েছে যে তার সঙ্গে ছুটেও যে পারব সে ক্ষমতাও নেই! কেবল দলছাড়া—কেবল ঘরছাড়া! কী যে খোঁজে জানি না! ভাবছি এবার বিয়ে দেব। তোমার চন্দ্রার সঙ্গে আমার শঙ্খর বিয়ে দেবে চন্দ্রার মা? চন্দ্রাকে আমার ভারি পছন্দ। কেমন দিব্যি কালোকোলো, চুকচুক্!

চন্দ্রার মা মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিলে—শোন কথা! চন্দ্রা আমার মিষ্টি মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে, তার গলাটি কেমন সরু, বুকে তার চাঁদ আঁকা—তার সঙ্গে তোমার ওই উড়নচণ্ডী ছেলের বিয়ে দেব? চন্দ্রার আমার ওই রকম ভোঁদা-গলা শাশুড়ি হবে?

শঙ্খর মা বলল—দেখ চন্দ্রার মা, মুখ সামলে কথা কও! চোখের মাথা কি খেয়েছ নাকি? আহা ওঁর কী গলার ছিরি! যেন পেটমোটা তালগাছ!

দেখ শঙ্খর মা!

দেখ চন্দ্রার মা!

ব্যস আর কোন কথা নয়, দুই পানকৌড়ি-গিন্নি ডানা ঝটপটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের ঘাড়ে। দেখতে-দেখতে সেখানকার জল তোলপাড় হয়ে মুক্তোর ফোঁটার মত চারিদিকে ছিটকোতে লাগল। বুড়ো পানকৌড়িরা অবজ্ঞার চোখে গিন্নিদের কাণ্ড দেখে চোখ ফেরালো, আর অন্যান্য পানকৌড়ি-গিন্নিরা, কেউ বা শঙ্খর মার, কেউ বা চন্দ্রার মার পক্ষ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আর-একটা যুদ্ধ পাকিয়ে তোলবার জোগাড় করতে লাগল। আর তাদের ছেলেমেয়ে নতুন পানকৌড়ির দল—এসব খুঁটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াকে তারা পছন্দ করে না। তাদের চোখে তখন নতুন পৃথিবীর নতুন নেশা, অগাধ রহস্য। তারা দলে দলে সার বেঁধে এগিয়ে চলে। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করল—কী, হল কী? আজ আবার কিসের ঝগড়া?

বল কেন?—একজন জবাব দিল—আমাদের শঙ্খচূড়ের সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ের কথা তুলেছিল শঙ্খর মা, তাই লেগে গেছে।

শঙ্খর সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ে? তা বেশ তো! চমৎকার হয়! এরকম একজোড়া পানকৌড়ি আর আমাদের সারা দলে নেই।

কিন্তু চন্দ্রার মা ঠিক করেছে চন্দ্রার বিয়ে দেবে কালকড়ির সঙ্গে।

অ্যাঁ? কালকড়ির সঙ্গে? ওই অকর্মা, কথার ঝুড়ি অকাল-বৃদ্ধটার সঙ্গে?

হ্যাঁ। চন্দ্রার মা বলে—কালকড়ি ভাল ছেলে, মায়ের কোলটি ছেড়ে কোথাও ছটকে যায় না, বুড়োদের সঙ্গে মিশে গল্পগুজব করে……

ফুঃ!

চন্দ্রা কী বলে?

ওকে বোঝা ভার!

কিন্তু আজ শঙ্খ কোথায় গেল তাকে দেখছি না যে! ওদিকে দুই পানকৌড়ি-গিন্নির ঠোকরাঠুকরি সমানে চলেছে, অন্যান্য গিন্নিরাও তখন কোমর বেঁধে দুই পক্ষ হয়ে পরস্পরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জোগাড় করছে, এমন সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

দুই যুধ্যমান পানকৌড়ি-গিন্নির মাঝখানে টুপ করে সাপের মত একটা মাথা জেগে উঠল। সেই কালো মাথার ওপর এতটুকু একটা সাদা ছিট সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠল। হঠাৎ সবল দুটো ডানার ঘায়ে দুই পানকৌড়ি-গিন্নি ছিটকে গেল দুদিকে। একটা কোলাহল উঠল—শঙ্খচূড়! শঙ্খচূড়!

শঙ্খচূড় বলল—কী হয়েছে কী? সক্কালবেলাই ঝগড়া কিসের?

চন্দ্রার মা বলল—ইস, আমায় ঠেলে দেয়! দে তো কালকড়ি ঠোক্কর!

শঙ্খচূড় তখন একমুখ জল ছেড়ে বললে—হুউস্!

কালকড়ি বুড়োদের দলে দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখছিল, তার দিকে ফিরে শঙ্খচূড় ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—চলে আও!

তার জলসিক্ত গলার চকচকে পালকে রোদ ঝকঝক করে উঠল।

কালকড়ি সোঁ করে জল কাটতে কাটতে বুড়োদের দলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বলল—হুঁ দেখে নেব, দেখে নেব, কাল দেখে নেব!

চন্দ্রা একপাশ থেকে বলে উঠল—দেখে নেবে তো নাও না, আমরা মজা দেখি।

কালকড়ি তখন জলের তলায় ডুব মেরেছে।

শঙ্খচূড় বলল—ব্যাপারটা কী? কী হয়েছে মা?

পানকৌড়ি-গিন্নি জবাব দিল—কী আবার হবে ? চন্দ্রার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলাম, তাই !

ওঃ, তাই ?

শঙ্খচূড় একবার চন্দ্রার দিকে চেয়ে টুপ করে জলে ডুব মারল। আর চন্দ্রা হঠাৎ ক-অ-ক্ করে ডেকে উঠে জলার পশ্চিম কোল ঘেঁসে জলের ওপর দিয়ে মারল ছুট-সাঁতার, আর দেখতে দেখতে তীরের মত ছোট হয়ে যেতে লাগল। তার মা তখনো চেঁচাচ্ছে—চন্দ্রা, চন্দ্রা !

চন্দ্রা তখন তীরের মত এগিয়ে চলেছে, একবার সে পেছন ফিরে দেখে নিল কেউ আসছে কি না। কিন্তু পেছনে সব ফাঁকা, পানকৌড়ির দল তার কাছ থেকে ছোট ছোট কালো কয়েকটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। একটা জলের রেখা তার পেছনে শির্‌শির্ করছে।

হুঁ! চন্দ্রা ভাবল—তাকে অমনি ধরতে পারলেই হল কিনা ! এদিকটা কেমন সুন্দর ! একটা শরের ডগায় বসে সবুজ মরকতের পোশাক-পরা মাছরাঙা টুপ টুপ করে লেজ দোলাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী শান্ত স্থির।

হঠাৎ তার লেজের ওপর এক ঠোক্কর। চন্দ্রা চেঁচিয়ে উঠল—কক্, ক-অ-ক্ !

শঙ্খচূড় খিলখিল করে পানকৌড়ি-হাসি হেসে উঠল—তারপর বললে—শোন। এই জলা ছেড়ে, ওই রূপসি পার হয়ে অনেক দূরে অন্য একটা জলার খোঁজে যাবি চন্দ্রা ?

চন্দ্রা বলল—ইস্, এটা ছাড়া পানকৌড়িদের আবার জলা আছে নাকি ?

হুঁ। যেন কালো-বৌ জলা ছাড়া আর জলা নেই।—সত্যি রে আমি আজকে দেখে এসেছি, তাই তো আমার আসতে এত দেরি হল।

চন্দ্রা বলল—হ্যাঁঃ, একটা ওড়নচণ্ডীর কথায় ভুলে মরি আর-কি ! থাকে তো থাক, তুমি যাও।

তাহলে যাবি না ?

না।

কিন্তু এই এক পুরোনো জলায় চিরকাল থাকবি ?

থাকবই তো, তোর কী ?

আচ্ছা দেখা যাবে।

শঙ্খচূড় আবার জলের নিচে এক ডুব মারল আর একদিকে যেখানে তরুণ পানকৌড়ির দল জলার ওপর সার বেঁধে চরছিল সেইখানে এসে এক ডুবে উঠল। একটা কলরব উঠল সেখানে—শঙ্খচূড় ! শঙ্খচূড় এসেছে ! কী খবর শঙ্খচূড় ?

আমি এলুম—ক-অ-ক !

পানকৌড়িরা তার সুরে যোগ দিল—কক্ কক্, ক-অ-ক্ !

শঙ্খচূড় বললে—দেখে এলুম ওই রূপসি নদী পার হয়ে অনেক দূরে তালবনের কোল ঘেঁসে মস্ত এক জলা আছে। সেখানে অনেক মাছ, অনেক গুগলি পাওয়া যায়।

পানকৌড়িরা বলল—সত্যি ?

হ্যাঁ রে ! আমি আজ সেখানে চলে যাব ঠিক করেছি, এই একঘেয়ে জলায় আর ভাল লাগে না। পৃথিবীটা কি এত ছোট নাকি যে চিরকাল এক জলায় পড়ে থাকতে হবে ?

পানকৌড়িরা বলল—তাই তো !

তাহলে ভাই সব ঠিক করে ফেল—কে কে আমার সঙ্গে যাবে ? কার চোখে নতুন পৃথিবীর নেশা লেগেছে ?

পানকৌড়িরা খানিকক্ষণ চুপচাপ। কেউ বা যেন কিছুই হয়নি মতন করে জলের নিচে মুখ ডোবাল।

শঙ্খচূড় জিজ্ঞেস করল—তাহলে কেউ যাবে না ? বেশ !

পানকৌড়ির দল থেকে একজন জবাব দিল—আমি যাব শঙ্খ, আমি !

আর হঠাৎ যেন দলে সেই ডাকের ছোঁয়াচ লেগে গেল।

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল—আমিও, আমিও !

আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দল—আমরাও যাব, আমরাও সকলে !

শঙ্খচূড় বলল—বেশ। তাহলে ঠিক রইল, আজ সন্ধ্যায়। সবাই আমায় অনুসরণ করবে।

পানকৌড়ির দল সায় দিল—আচ্ছা।

কালকড়ি বয়সে অল্প কিন্তু মনে একেবারে বৃদ্ধ। সে একপাশ থেকে পানকৌড়িদের দলের সমস্ত কথা শুনছিল। সে তীরের মত এসে যেখানে বুড়ো পানকৌড়ি আর তাদের গিন্নিরা জলের ওপর চরছিল সেখানে খবরটা দিয়ে দিল।

চন্দ্রার মা চন্দ্রাকে বলল—খবরদার চন্দ্রা তুই যাসনি। ওই কালকড়ি ভাল ছেলে, ও থাকবে এ দলে। ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব—ভাবনা কী ?

চন্দ্রা বলল—আচ্ছা মা।

বুড়ো পানকৌড়িরা খবর শুনে বলল—স্বভাবের ধর্ম যাবে কোথায় ? আমরাও একদিন পুরোনো দল ছেড়ে এই কালো-বৌ জলায় চলে এসেছিলাম, মনে আছে তো ? ওদের এখন নিজেদের দল বাঁধবার সময় হয়েছে, চিরকাল কি মায়ের ডানার তলায় পড়ে থাকবে নাকি ? পানকৌড়িদের নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখা চাই।

একজন বলল—কিন্তু কালকড়ি ?

ওটা একটা দলের কলঙ্ক !

কালকড়ি তখন চন্দ্রার সঙ্গে ভাসতে ভাসতে শরবনের আড়াল দিয়ে অনেকটা দূরে মিলিয়ে গেছে।

মাছ, মাছ !—চন্দ্রা চেঁচিয়ে উঠল।

কালকড়ি বলল কই ?

ওইতো, ধর না !

একটা সবুজ মাছরাঙা বিদ্যুতের মত ছোঁ মেরে মাছটা ধরে নিয়ে গেল।

নাঃ তুমি কিচ্ছু নয় !

কালকড়ি বলল—হ্যাঃ! আমি ইচ্ছে করলেই ওটাকে ধরতে পারতাম। আসুক না আর-একটা!

চন্দ্রা বলল—তাই বটে, মাছ তোমার একেবারে মুখে উঠে আসবে!

জলের নিচে আবার একটা সিপ-সিপ শব্দ। মাছের লেজের জল-কাটার সে আওয়াজ জলচর প্রাণী ছাড়া কেউ শুনতে পায় না। চন্দ্রা ডেকে উঠল—ওই যে, ওই যে—আর-একটা পালাচ্ছে, শিগগির ধর!

কোথায়?

জলের নিচের সিপ-সিপ শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। টুপ করে একটা মাথা জেগে উঠল তাদের মাঝখানে। শঙ্খচূড়ের মুখে মাছটা তখন ছটফট করছে।

নে চন্দ্রা তোর জন্যে ধরেছি—

চন্দ্রা কপ করে শঙ্খচূড়ের মুখ থেকে মাছটা তুলে নিল।

শঙ্খচূড় বলল—আমি আজকে চলে যাচ্ছি চন্দ্রা—

নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা বলল—যাচ্ছিস তো যা না!

তুই যাবি না আমার সঙ্গে?

কোথায় মরতে যাব?

মরতে নয় রে, নতুন পৃথিবী, নতুন জলা......

চন্দ্রা বলল—যা যা—জ্বালাস নি!

কালকড়ি ক-অ-ক্ করে হেসে উঠল।

তার দিকে লাল চোখে চেয়ে শঙ্খচূড় বলল—আচ্ছা বেশ! আবার জলের তলায় মাথাটা যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে কালো-বৌ জলার জলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে রক্তমাখা সাঁঝ নেমে এল গাঁয়ের বুকে। পানকৌড়িরা দিনের শেষ হল দেখে জলের ওপর ডানা ঝাপটে আবার আকাশে ওঠবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। তরুণ পানকৌড়িরা সন্ধ্যার বুক কাঁপিয়ে তাদের

যাত্রার ডাক ডেকে উঠল—কক্ কক্ ক-অ-ক্! কই শঙ্খচূড়? আমরা তৈরি!

শঙ্খচূড় বলল—আমিও তৈরি, তবে একটা শেষ ব্যাপার আছে, চুকিয়ে নিয়ে যাই।

শঙ্খচূড় জলের তলায় ডুব দিল।

কালকড়ি আর চন্দ্রা তখন পুরোনো দলে ফিরছে। ঠিক তাদের মাঝখানে আচমকা শঙ্খচূড়ের মাথাটা টুপ করে জেগে উঠল। শঙ্খচূড় ডেকে উঠল তার যুদ্ধডাক—ক-অক্, কক্!

কালকড়ি সে-ডাকের অর্থ জানে। এক ঝটকায় সে চন্দ্রার পাশ থেকে ছিটকে গিয়ে ভীত করুণ কণ্ঠে ডেকে উঠে মারলে জলে ডুব। পানকৌড়ির দল হেসে উঠল—হাঃ হাঃ, ক-অ-ক্!

এক মুহূর্ত জল স্থির, তারপরে প্রায় চন্দ্রার পাঁচহাত দূরে জলের মধ্যে উঠল একটা আলোড়ন। সবাই বিস্ময়ে চেয়ে দেখল, শঙ্খচূড়ের ঠোঁটের মধ্যে কালকড়ির গলাটা জলের ওপর ঠেলে উঠেছে। কালকড়ি চ্যাচাচ্ছে——ক্যাঁ, ক্যাঁ!

শঙ্খচূড় এক ঝটকায় জলের ওপর দিয়ে তিন হাত দূরে তাকে ছিটকে ফেলে দিল।

কালকড়ি আবার চেঁচিয়ে উঠল—ক্যাঁ, ক্যাঁ!

তারপরে জলের নিচ দিয়ে এক ডুবে সে তার মায়ের ডানার নিচে এসে মুখ লুকোল।

শঙ্খচূড় বলে উঠল—কী বীর!

তারপর সে ছাড়ল তার বিজয় চীৎকার—ক-অক্, কঁক্ কঁক্!

চন্দ্রা তখন অবাক হয়ে তার জলসিক্ত অদ্ভুত বিজয়ী মূর্তির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

শঙ্খচূড় তার দলকে বলল—চলরে চল, আমার কাজ হয়ে গেছে।

বুড়ো পানকৌড়িদের প্রথম সার তখন ডানায় ডানায় বাতাস কাঁপিয়ে আকাশে উঠেছে।

দেখতে দেখতে পানকৌড়ির অদ্ভুত সেই সারে পশ্চিমের আকাশ



ভরে গেল। গাঁয়ের রিক্ত উদাস অভ্যন্তর থেকে প্রথম শাঁখের ডাক জলার জলে লুটিয়ে লুটিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। রুপসি নদীর পাড় থেকে কাঁসরের আওয়াজ ভেসে আসছে—ঢং ঢং ঢং। হঠাৎ মাথার ওপর পানকৌড়ির সার অদ্ভুত এক রেখায় দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। শঙ্খচূড় ডেকে উঠল—আয় আয়, আমার সঙ্গে কে যাবি রে আয়।

শঙ্খচূড়ের দল নমনীয় সর্পিল গতিতে রুপসি নদীর দিকে বাঁক নিল। দলের আগে সবল ডানায় শাঁই শাঁই করে ছুটে চলেছে শঙ্খচূড়।

মায়ের পাশ থেকে আড় চোখে চন্দ্রা তাদের দেখে নিল।

কী দেখছিস কী? তার মা জিজ্ঞেস করল।

চন্দ্রা আর কোন কথা না বলে হঠাৎ বাঁক নিয়ে সেই অসীম শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরে শঙ্খচূড়ের দল লক্ষ্য করে তীরের মত হাওয়ায় দুলতে দুলতে এগিয়ে যেতে যেতে ডেকে উঠল—ক-অ-অক্!

———

খড়কাইয়ের বনে একরাত

পশ্চিমের রক্তিম ধূসরতার ওপর ধীরে ধীরে রাত্রি তার কালো যবনিকা টেনে দেয়। খড়কাই বনের ওপর ঘনিয়ে আসে কালো রহস্যময় ছায়া। দূরে, বহুদূরে নন্দাদেবীর তুষারাচ্ছন্ন মুকুটের ওপর করুণ একটুকরো আলো রুপোর মত চিক চিক করতে থাকে। প্রাণীজগতের বিশ্রাম—বনে রাত নেমে এল।

বনতিতির তারস্বরে ডেকে উঠে তার সন্ধ্যা-বন্দনা সেরে নেয়। তারপরে তার পাঁচটা বোকা বৌ-এর উদ্দেশ্যে হাঁক দেয়—চল, চল, বাসায় যাবার সময় হল। এখন বেরোবে বনবেরাল, সাদা শেয়ালগুলোর কথাও বলা যায় না। শত্রুরা নিপাত যাক!

বৌ পাঁচটার সাড়া দেবার লক্ষণই দেখা যায় না। পাঁচটাই সমান পেটুক। মাটিতে খুঁটে খুঁটে তারা পোকা খেয়েই চলে—বরং খাওয়ায় যেন তাদের অধিকতর উৎসাহ দেখা যায়। তারা বুঝতে পেরেছে, সেদিনের মত খাওয়া তাদের শেষ, তাই রাতের জন্য পেটটি বোঝাই করে নেওয়া চাই। এই ঠাণ্ডায় শরীরটা গরম থাকবে।

বনতিতির উড়ে গিয়ে একটা পাইন গাছের ডালে বসে। মরা আলো একবারটি তার লাল সবুজ হলদে মকরত বর্ণাঢ্য দেহে ঝকমক করে উঠতে চায়, কিন্তু পারে না। আলো মরে গেছে। আবার পরদিন আসবে সূর্য, আবার সোনালি উজ্জ্বল রোদ তার সুবর্ণ দেহে প্রতিফলিত হয়ে ঝিকমিক করে হেসে উঠবে। কাল আবার আসবে প্রভাত। কিন্তু প্রাণীজগতে প্রত্যেকটি কালই অনাগত। বর্ত্তমানেই তাদের জীবন।

রাতেই বেরোয় রাতচরা ভাল্লুকের দল। বিশাল শরীর পাঁশুটে

ভাল্লুকমা নাক দিয়ে বাচ্চাদুটোকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে চলে। আকাশে নাক তুলে বাতাসের ঘ্রাণ নেয়। কোথায় বিপদ? কোথায় শিকার? খালি গাছের শেকড় চিবিয়ে চিবিয়ে ভাল্লুকদের অরুচি ধরে গেল। বসন্ত আসেনি, মৌমাছিরা মধুচাক গড়া শুরু করেনি এখনও। বাচ্চাদুটো খেলা করতে করতে পথে ছটকে পড়ে। ভাল্লুকমা সাবধানী ডাক ছাড়ে—ঘ্ ঘ্! বাচ্চাদুটো ফিরে আসে মায়ের বুকের কাছে। ভাল্লুকদের লোমওয়ালা পায়ের নিচে পথ-চলার শব্দ মরে যায়। ভাল্লুকেরা লম্বা সারে এগিয়ে চলে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ভাল্লুকমা। কানে তার একটা ক্ষীণ চীৎকার ভেসে এসেছে। ছাগলছানার ডাক না? বাতাসে মুখ তুলে ভাল্লুকমা দিক ঠিক করে। ক্ষীণ. ক্ষীণতর শব্দ, বনের অজস্র রহস্যময় শব্দের মধ্যে মিলিয়ে যেতে থাকে।

খড়কাই-এর বনে পাহাড়ি উপত্যকাটার কোল ঘেঁসে একটা ছোট জলা। জলার ওপর বন আর পাহাড় যেন ঝুঁকে পড়েছে। সেই জলায় সম্বরেরা জল খেতে আসে! কালো বাঘ তাই জলার ধারে বড় বড় ঘাসের মধ্যে ওৎ পেতে বসে থাকে। আর সাদা শেয়াল চোরের মত নিঃশব্দ দ্রুত গতিতে চলাফেরা করে। রাতেই যাযাবর হাঁসেরা আশ্রয় নেয় জলায়। দিনে তাদের দূর পাড়ি—পার হয়ে বরফান পাহাড়, মেঘের কোল ঘেঁসে, অনুকূল বাতাসের অনুসঙ্গে।

থেকে থেকে জলার মাথায় হঠাৎ একটা আগুনের গোলা লাফিয়ে ওঠে। বাঘেরা সরে যায়। ধূর্ত শেয়াল লেজ তুলে ছুট মারে। হাঁসেরা ডেকে ওঠে—প্যাঁক প্যাঁক পেঁয়াক!

আগুনের গোলাটা জলার বুকে লাফালাফি করতে থাকে। কখন ওপরে ওঠে, কখনও জলের কোল ঘেঁসে কাঁপে। কখনও হু-হু করে পেছিয়ে যায়, কখনও ছুটে এগিয়ে আসতে থাকে। তখনও ঠিক যেন মনে হয়, বন পাহাড়ের কোন অশরীরী আত্মা বিশ্রান্ত বনের ওপর অজস্র সময় পেয়ে আগুন নিয়ে তার ভুতুড়ে খেলা শুরু

করেছে। পাহাড়িরা ওই আগুন দেখে বলে—জলার ভূত। হঠাৎ আগুনটা দপ করে নিভে যায়। পাহাড়ে বনে আবার কালো ছায়ার অখণ্ড প্রভাব। এমনি ভাবেই জলার ধারে আলেয়ার জন্ম এবং মৃত্যু।

কিন্তু প্রাণীরা আগুনকে ভয় পায়।

বনের আরও একপ্রান্তে, পাইনকাঠের রজনাক্ত গন্ধ বয়ে আগুন খল খল করে হাসতে থাকে। বনের সেই প্রান্তে একটা তাঁবু। তাঁবু থেকে খানিকটা দূরে কালো অন্ধকারে, গাছের গুড়িতে বাঁধা একটা ছাগলছানা থেকে থেকে করুণ চীৎকার করে, আর তাঁবুর ভেতর জালে জালে জড়ানো একটা ঈগলের ছানা থেকে থেকে ঝটপট করে ওঠে। বেচারি ঈগলের ছানাটা ওই বাচ্চা ছাগলটার লোভে পড়েই আজ শিকারীর জালে জড়িয়েছে। স্বাধীন জীবন তার শেষ। তবু বলা যায় না—বন্য জীবনে প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করে থাকে বিস্ময়।

শিকারীকে কিন্তু তাঁবুর ভেতর দেখা যায় না। ঈগলটা তার দামে বিকোবে। ভাল্লুক শিকার করবে বলে লালসিং আজ রাতে ছাগলছানাকে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু আচমকা সে ওই বনতিতিরটার আড্ডার সন্ধান পেয়ে গেছে। ওই বনতিতিরটার পেছনে সে আজ বছরের পর বছর ঘুরেছে, কখনও শিকার করতে পারেনি। ওর ওই অদ্ভুত রঙিন পালকগুলোর ওপর লালসিং-এর বহুদিনের লোভ কিন্তু বনতিতিরটা বেজায় চালাক, দিনে ওর নাগাল পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আজ রাতে একবার লালসিং ওকে দেখবে।

বনের মাথায় চাঁদ উঠল—ক্ষীণ পাণ্ডুর একটা নীলচে রুপোলি রেখা। আর সেই আলোয় বন হয়ে উঠল রহস্যঘন, গম্ভীর। নন্দাদেবীর মাথা বেয়ে যেন নীলচে সাদা তুষারের দল গলে গলে উপচে পড়তে চায়। পৃথিবীর বন্য, আদিম।

লালসিং-এর পায়ের নিচে ছোট একটা মরা ডাল মট করে ভেঙ্গে যায়। বনতিতিরের পাঁচ বৌয়ের একটা হঠাৎ জেগে বন্য সেই

ভুতুড়ে স্তব্ধতা ভেঙে ডেকে ওঠে। হঠাৎ জেগে বনতিতিরটা যেন কি একটা আশঙ্কাময় অনুভূতিতে ছটফট করে ওঠে। সে পাইনের ডালটা থেকে উড়ে গিয়ে একটু দূরের আর-একটা গাছে গিয়ে বসে। তার জীবনের অলক্ষ্য দাঁড়ি সেইখানে টানা হয়ে যায়। সেখান থেকে তার বুক আর লালসিং-এর বন্দুকের পাল্লা সরল। মরা চাঁদের আলো তার বর্ণাঢ্য দেহের ওপর ঝলমল করতে থাকে।

এই বনে বনবেরালের ভারি অসুবিধে এখন। দিনে তো শিকার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ছোট জানোয়ারগুলো বেজায় চালাক হয়ে গেছে। আর যদিবা একটা আধটা পাওয়া গেল, টান হয়ে লাফ মারবার আগেই—হুস্ ! কোথা থেকে ওই হতভাগা ঈগলের ছানাটা ঠিক ছোঁ মেরেছে। রাগের মাথায় বনবেরাল কতদিন মেরেছে ভীষণ লাফ, ঈগলের ছানাটাকে ধরবার জন্য। কিন্তু ডাঙার জানোয়ার, আকাশের পাখির ছানাকে ধরতে পারবে কেন ? রাগে গোঁ গোঁ করাই সার। ঈগল ছানাটার ওপর বনবেরালের তাই বেজায় রাগ। দিনে শিকার জোটে না, রাতেই তাই বেরোতে হয়।

বনবেরালের মানুষকে বিশেষ ভয় নেই। কারণ, ওই জানোয়ারটার ওপর মানুষের লোভ কম, আর তাছাড়া বনবেরাল শেয়ালের চেয়েও চালাক প্রাণী। লালসিং-এর তাঁবুটার ধারে এসে সে লক্ষ্য করে—তাঁবুর একটা ধার নড়ছে। সে জানে শিকারীর তাঁবুতে নানারকম খাদ্য পাওয়া যায়। তাঁবুর কোণাটা ঠেলে নিচু হয়ে সে ঢুকে পড়ে এবং পরমুহূর্তেই তার ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন শোনা যায়। চিরশত্রু ঈগলছানাটা তার সামনে! বেচারি ঈগলছানাও ফোঁস করে, তার থাবার তীক্ষ্ণ নখ তুলে আক্রমণ করতে যায়, কিন্তু জালে আরও জড়িয়ে পড়ে সে। খাঁড়ার মত বাঁকা ঠোঁটটা সে কোনমতে জাল থেকে বার করে আনে। বনবেরাল ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা ভয়ঙ্কর ঝটাপটি শোনা যায়।

বনতিতিরের বুকটা লক্ষ্য করে লালসিং এর বন্দুক ধীরে ধীরে



উঠতে থাকে। একটু হলেই পাখিটা এখনি সজাগ হয়ে যাবে। এমনি কতবার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে থেকেও বনতিতিরটা তাকে ফাঁকি দিয়েছে। এবার আর সুযোগ ছাড়বে না লালসিং। মাথার ওপর ম্লান চাঁদ পাণ্ডুর, উদাস। কালো আকাশে তারাদল সহস্র চোখে ঝকঝক করে। লালসিং ট্রিগারে আঙুল দেয় আর হঠাৎ তার কাঁধের ওপর বিরাট একটা গাছ যেন ভেঙে পড়ে। ঠাণ্ডা, পিছল, কনকনে। মুহূর্তের মধ্যে একটা বিরাট চাপে লালসিংএর দম বন্ধ হয়ে আসে। কে যেন মৃত্যু-আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে তাকে। লালসিং চীৎকার করে ওঠে।

সে যখন শিকার নিয়েই ব্যস্ত তখন আর-একটা শিকারী তাকে শিকারের জন্য তিল তিল করে এগিয়ে এসেছে। পাইন গাছ থেকে একটা হিমালয়ের পাইথন লালসিংএর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। দম প্রায় শেষ, শরীরের হাড়গুলো এক মুহূর্তে গুঁড়িয়ে যাবে, তবু লালসিং পাহাড়ির বাচ্চা। পাইথনটার মাথাটা তার মুখের কাছে প্রকাণ্ড একটা গাছের গুড়ির মত নড়ছে, শরীর বাঁধা। প্রাণপণ শক্তিতে লালসিং বন্দুকটা ঘোরায়। পাইথনটার গরম নিশ্বাস তখন তার মুখে লাগছে। এক মুহূর্ত বন্দুকটা পাইথনটার মাথার ওপর লাগিয়েই লালসিং ট্রিগার টিপে দেয়। নিস্তব্ধ বন কেঁপে ওঠে। লালসিং অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে।

বনতিতিরেরা পালিয়েছে কোন্ আগেই।

নিঃশব্দ অন্ধকারে ছাগলছানাটার কাছে এসে দাঁড়ায় ভাল্লুকমা। মানুষের গায়ের গন্ধ সে ভাল করেই জানে। বাতাসে নাক তুলে তুলে সে বার বার ঘ্রাণ নেয়। কাছাকাছি মানুষের গায়ের গন্ধ নেই।

ছাগলছানাটা একবার চীৎকার করে ওঠে, তারপরে তার ডাক থেমে যায়। তাঁবুর ভেতর পাইনকাঠের আগুন নিভে গেছে। পড়ে আছে অঙ্গারগুলো আর বাতাসে তীব্র রক্তাক্ত গন্ধ।

রক্তাক্ত মুখে, রক্তাক্ত দেহে বনবেরালটা বেরিয়ে আসে। চিরশত্রু ঈগলছানা তাঁবুর ভেতর বনবেরালের নখে ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে পড়ে আছে। চোরের মত নিঃশব্দে বনবেরাল অন্ধকার গা-ঢাকা দেয়।

ভাল্লুকেরা লম্বা সারে ফিরতি পথ ধরে।

পুব আকাশে রাতের যবনিকা ধীরে উঠতে থাকে। চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়ে। মৃত্যুমুখেও ম্লান হাসি তার মিলোয় না। শুকতারাটা পুবে, চাঁদের চেয়েও জ্বলজ্বলে হাসি হাসতে থাকে। হিমালয়ের ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে আসে। বন কাঁপে। রহস্যমাখা খড়কাই কুয়াসার আস্তরণে ঝিম-ঝিম। প্রভাতের আগের মুহূর্তে নন্দাদেবীর ধ্যান যেন গুরুগম্ভীর। অনুকূল বাতাসে মেঘের দল উত্তরে ধেয়ে চলে। জলায় যাযাবর হাঁসেরা জেগে উঠে পাখা ঝাড়া দেয়।

লালসিং টলতে টলতে তাঁবুতে ফেরে। দূর থেকে বনতিতিরের পাঁচটা বোকা বৌএর ডাক তার কানে ভেসে আসে—যেন ঠাট্টা করছে।

———

রঙিলা-বৌ

কালশরীর বিলের জলে একটা রুপোলি ঢেউ শির শির করে এগিয়ে এল। শরবনের শুকনো শরে হাওয়া ঢুকে বাঁশির মত মধুর আওয়াজ স্বচ্ছ আকাশে কেঁপে কেঁপে উঠে যাচ্ছে। কালশরীর বিল বিস্তৃত উদাস মরুভূমির মত দিগন্তে ছড়িয়ে আছে। যতদূর দৃষ্টি চলে জল আর জল। জলার পুব গা ঘেঁসে বন ঘন সবুজ থেকে ঘনতর হতে হতে কালচে সবুজ হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে। উষার ধূসর ছোঁয়াচ লেগেছে বনের মাথায়। নিস্তরঙ্গ জলার রুপোলি ঢেউটা শির শির করে আসতে আসতে শরবনে একটা শাপ হয়ে মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর উঁচুতে যাযাবর বুনো হাঁসের ডাকে পৃথিবী যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে সূর্যের দিকে মুখ ফেরাল।

হাঁসেরা সব আসছে।

অনেক দল এসে পৌঁছে গেছে, আরও আসছে। দূর দূরান্ত দেশে শীতে জমে গেল হ্রদ জলা বাদা। সেখানে কুয়াসার সঙ্গে নামছে বরফ। হাঁসেরা তাই গরম দেশে এল চলে। গরম দেশে শীতটা কাটিয়ে গ্রীষ্মের আগেই তারা আবার ধরবে আকাশ-পথ। এখন শীতের কুয়াসাভরা আকাশ এখানে বুনো হাঁসের চিকণ ডানায় চিত্রিত হয়ে উঠল।

জলার ধারে শরবন থেকে জমিটা যেখানে ঢালু হয়ে উঠে গেছে, সেখানে সবুজ ঘাসে একটা জায়গা দেখে রঙিলা তার বাসা বেঁধেছে। রঙিলার বৌ দিনরাত ডিমের ওপর বসে আছে। কচি কচি সাদা দুধের মত দুটো ডিম

রঙিলা আকাশের দিকে চেয়ে বলল—দেখেছ, এখনও সব

এসে পৌছলো না। আর দেরি হলে পথে ঠাণ্ডায় জমেই যে মারা যাবে! আমাদের এদিকে বাচ্চাদের ফোটবার সময় হল। রঙিলার বৌ বলল—ভালয় ভালয় হয়ে গেলে বাঁচি!

—কেন এখানে আর ভয় কী?

—তা কি আর বলা যায়? চোখ-জ্বলা প্যাঁচাগুলোকে কিছু বিশ্বাস নেই। কোথা থেকে যে হতভাগা সাপের পো এসে আমার ডিম বাছাদের মেরে খাবে কিছু বলা যায় না—

ডানা ফুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে রঙিলা গরব করে বলল—ওঃ, আসুক না একবার, ঠুকরে সেরে দেব না!

বৌ বলল—কত মুরোদ জানা আছে!

—তোমার একটুও বিশ্বাস নেই আমার ওপর—রঙিলা জবাব দিল।

বাসা থেকে উঠে রঙিন ডানাটা মেলে রঙিলা একবার ঝটপট করে উঠল, তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে রুপোলি স্বরে ডেকে উঠল—প্যাঁক প্যাঁক, পেঁ-য়া-ক!

তারপর থপ-থপ করে সে নেমে এল জলার ধারে। জলার জলে ঠোঁটটা লাগিয়ে সে যেন একবার জলের স্বাদটা দেখে নিল, তারপরে আলগোছে নরম সাদা বুকটা জলের উপর ভাসিয়ে দিয়ে পেছনে জলের শিরশিরে রেখা রেখে এগিয়ে গেল। জল এখানে গভীর নয়। নিচে নরম কাদা মাটি, মাঝে মাঝে শালুক ফুটে আছে। টুপ করে গলাটা জলের ভেতর ডুবিয়ে দিল রঙিলা, পেছনে পুচ্ছটা তার উঁচু হয়ে উঠল। এখানকার জলে অনেক শামুক গুগলি পাওয়া যায়। নিশ্চিন্ত মনে রঙিলা তার প্রাতরাশ সেরে নিল।

আকাশে সূর্যদেবের সোনার মুকুট ঝলসে উঠছে; বন থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত সব শব্দ। দূরে দূরে হাঁসেরা ভাসছে জলে। রঙিলা ফিরল ডাঙ্গার দিকে। গিন্নিকে তার খানিকটা ছুটি দিতে হবে। সে সেরে নেবে প্রাতরাশ। ততক্ষণ ডিমের উপর বসবে সে।

রঙিলা ভাসতে ভাসতে শরবনের গা ঘেঁসে ডাঙ্গায় এসে লাগল। একটা মুহূর্ত। শরের গুচ্ছ চামরের মত রঙিলার মাথায় হেলে পড়েছে, শিরশির করে কাঁপছে মৃদু হাওয়ায়। রঙিলা ডাঙ্গায় পা দিতে যাবে, কি যেন কিলবিল করে উঠল পায়ের নিচে। রঙিলা প্যাঁক্ করে ডেকে সরে যেতে গেল, কিন্তু সাপটা তখন জড়িয়ে গেছে তার পায়ে। ঝটপট করে রঙিলা গিয়ে ডাঙায় পড়ল আর তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল—প্যাঁক প্যাঁক !

একটা করুণ চীৎকার, সাপটা ছোবল মেরেছে রঙিলার নরম সাদা বুকে। মৃত্যু-কাতর সে চীৎকার কেঁপে কেঁপে আকাশে উঠে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল।

—পেঁ-য়া-ক্।

রঙিলা ঢলে পড়ল শরবনের কোলে। কালো সাপটা কিলবিল করতে করতে নেমে গেল। শরবনের শুকনো শরে বাতাসে টুকে রঙিলার করুণ চীৎকার যেন উদাস জলার ওপর ছড়িয়ে দিতে লাগল।

বাচ্চারা ফোটবার আগেই বাপকে হারাল তারা।

চিকির কাছে পৃথিবীটা ভারি সুন্দর এখন। হবে না-ই বা কেন ? ফুর্তিমাখা তার শরীর নরম তুলতুলে। সোনালি উজ্জ্বল চোখ, ধারাল নখ আর দাঁত। অনেক বিশ্বাস তার মনে। সে এখন মা ছাড়াই বনে চলা-ফেরা করে বেড়াতে পারে। বনের কন্দরে কন্দরে কত নতুন বিস্ময়—চিকি অবাক হয়ে যায়। বুড়ো বেজিরা চিকির মাকে বলে—ছেলে এত বড় হল এখনও সাপ মারতে শেখালে না—এ কি ?

চিকির মা হাসে, বলে—রক্তের তেজ যাবে কোথায় ? ও শেখাতে হয় না, শত্তুরের সামনে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।

চিকি এখন টুকটুক করে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। বনে খাবারেরও ভাবনা নেই, নতুন জিনিসেরও অভাব নেই—ভারি মজা। সেদিন সকালে চিকি বন থেকে বেরিয়ে এল জলার দিকে। বন এখন কেমন যেন জীবন্ত। দলে দলে হাঁসেরা নেমেছে জলায়।

হাঁসেদের সঙ্গে চিকির শত্রুতা নেই—তারা তো আর সাপ নয়! মা বলে দিয়েছে—খবরদার চিকি, হতভাগা সাপগুলোকে কখনও বিশ্বাস করিস নি! হাঁসেরা শান্ত নিরীহ। তাদের চলা ফেরা জলের ভেতর ডুব দেওয়া চিকির অদ্ভুত লাগে। চিকি এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে চমকাতে চমকাতে এগিয়ে চলে।

বেলা বয়ে যায়, রঙিলা এখনও ফিরল না। রঙিলার বৌ ডিমগুলোর ওপর বসে বসে ভাবল—ডিম ফোটবার সময় হল—তুলতুলে নরম বাচ্চা হবে, তার এখন কত কাজ! তবু জীবনটা তো রাখতে হবে! তারও তো কিছু খাওয়া দরকার। কিন্তু রঙিলার হুঁস নেই। সে বোধহয় এখনো পেটুকের মত খেয়েই চলেছে। নাঃ আর পারা যায় না!

রঙিলা-বৌ উঠল। দেখা হলে এমন ধমক দেব যে বুঝিয়ে দেব মজা। ডানা ঝাপটে উঠে এল সে। থপথপিয়ে চলল জলার ধারে। হায় রে! সে তো আর জানে না যে রঙিলা আর ইহজগতে নেই। রঙিলা-বৌ রাগ করে গলা ফুলিয়ে চলল জলার ধারে। সে জানে না যে ডিমগুলোকে একা ফেলে যাওয়ায় কী বিপদ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে! প্রকৃতপক্ষে, চিকি যদি সেদিন এদিকে না বেড়াতে আসত তাহলে।···

এদিকে সাপটা গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে ডিমগুলোর লোভে এগিয়ে আসছিল। ঘাসের মধ্যে সর-সর-সর। রঙিলা-বৌ একবার চমকে উঠল। সাপটা তখন ঘাসের মধ্যে নিঃশব্দে স্থির হয়ে গেছে তাকে দেখে। মায়ের সামনে থেকে ডিম কেড়ে নিয়ে যেতে অতি বড় শক্তিশালী প্রাণীও ভয় পায়। কোথাও আর শব্দ না শুনে রঙিলা-বৌ আবার নিশ্চিন্ত মনে এগোল জলার দিকে। সাপও এগোল তখন। হাঁসের বাসার কাছে সে প্রায় এসে পড়েছে। কচি ডিমের লোভে জল ঝরছে তার চেরা জিভে—আর একটু এগোলেই, ব্যস!



কিন্তু সাপ আর এগোল না। গায়ের রক্ত তার হিম হয়ে গেল। সামনে একজোড়া সোনালি চোখ অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। চিরশত্রু বেজি সামনে, চুকচুক করছে তার লাল মুখ। সাপ ফণা ধরে ফোঁস করে গর্জে উঠল।

চিকি এর আগে কখনও সাপ দেখে নি। সাপের সামনে পড়ে সে অবাক হয়ে চেয়ে দেখল —ওঃ এই সাপ?

তার দৃষ্টিতে কোন রাগ নেই। স্থির, বিস্মিত তার চোখ। কিন্তু সাপটা যেই ফোঁস করে গর্জে উঠল অমনি জন্ম-জন্মের অনুপ্রেরণায় তার রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু চিকিকে স্থির দেখে সাপ ঝাঁ করে এক ছোবল মারল। বিদ্যুতের মত একলাফে চিকি পেছিয়ে এল। ছোবল ফসকে সাপ আবার ফণা ধরে রাগে হিস্ হিস্ করতে লাগল। চিকি তখন যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাপটা দুলছে, সামনে চিকি পাথরের মত স্থির। সাপটা তাক করে মারল আবার ছোবল। সে ছোবল যদি গায়ে পড়ত তাহলে পৃথিবীর আলো চিকির ওইখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু চিকি বিদ্যুতের মত সরে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সাপটার মাথার উপর দিয়ে মারল এক লাফ। সেই লাফের সঙ্গে তার ধারাল নখের ঘায়ে সাপের মাথাটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

—হিস্ হিস্ হিস্ হিস্।

সাপ মরিয়া হয়ে আবার ছোবল মারল, আবার চিকির লাফ, আবার সাপের মাথা ক্ষত-বিক্ষত। কিছুক্ষণ চলল এমনি। প্রতিটি ছোবলে চিকি সরে গিয়েই লাফ মারে, আর তার নখের ঘায়ে সাপ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। একটু একটু করে সাপটা নির্জীব হয়ে আসতে লাগল, তারপরে এক সময়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তার ফণা আর উঠল না শূন্যে। চিকির রাগ কখনও থামেনি। সাপটা লুটিয়ে পড়তেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপরে তার ধারাল দাঁতে সাপটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মুখে রক্ত মেখে চিকি ছুটে চলল বাসায়। চিকির মা গর্তের ধারে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল, তাকে দেখে চমকে বলে উঠল—ওমা এত রক্ত কিসের?

—সাপ মেরেছি।

—সাবাস! বলে উঠল চিকির মা—তারপরে বুড়ো বেজিদের ডেকে সে বলল—কেমন, বলিনি যে শেখাতে হবে না? বুড়ো বেজিরা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলল—ঠিক, ঠিক!

শরবনের ধারে জলার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে রঙিলা-বৌ ক্রুদ্ধ স্বরে ডেকে উঠল—প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁ-অ্যা-ক!

এই ডাক রঙিলার অনেক চেনা ছিল একদিন। এই ডাককে সে ভয় করত, জানত বৌ চটেছে। কিন্তু আজ কে সাড়া দেবে? রঙিলা-বৌ একটু এগিয়েই দেখতে গেল তাকে। তার বুক ধ্বক করে উঠল। পড়ে আছে কেন—নড়েও না চড়ে না! ও তবে কি—? রঙিলা-বৌ তার কাছে এগিয়েই চীৎকার করে উঠল। তারপরে চীৎকার করতে করতে পাগলের মত রঙিলার চারপাশে ছুটে বেড়াতে লাগল।

সাপের বিষে রঙিলা নীল হয়ে গেছে। দুঃখের প্রথম ধাক্কাটা কমতেই তার নীল রং নজর পড়ল রঙিলা-বৌ এর। সাপে কামড়েছে! সে সাপটা কোথায়? তার বুক ভয়ে আবার ধ্বক করে উঠল। তার ডিমেরা যে খালি পড়ে আছে। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রঙিলা-বৌ ছুটলো বাসার দিকে। হায়, হায়, কী হল? কী হল?

পথে যেতে যেতে রঙিলা দেখল, একটা মরা সাপ টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বৌ এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, তারপরে তার বাসায় অস্ফুট কি একটা শব্দ শুনে সে আবার পাগলের মত বাসার দিকে এগিয়ে গেল।

অস্ফুট করুণ মৃদু একটা শব্দ—পিঁক পিঁক, পিঁক পিঁক!

বাসার সামনে এগিয়ে যেতেই রঙিলা-বৌ দেখল, ডিমদুটো ফেটে তার মধ্যে থেকে দুটো রোঁয়াহীন কচি-কচি গলা তার দিকে চেয়ে ডাকছে—পিঁক পিঁক, পিঁক পিঁক!

ভয়ের ঢেউ তার শরীর থেকে নেমে গেল। কচি বাচ্চাদের সে ডাক রঙিলা-বৌয়ের কানে মধু ঢেলে দিল। সে ছুটে গিয়ে ডানাদুটো খুলে বাচ্চাদের আগলে চাপা দিয়ে বসল।

———

মরকেতু কাহিনী

কালশরীর বিলে বালি হাঁসের দল নেমেছে কিছুদিন হল। বিলে বাদায় বনে দলে দলে ছড়িয়ে গেল তারা। তাদের মুখরিত কলরবে বনের প্রান্ত আবার উঠেছে জীবন্ত হয়ে। শীতের মুখেই শীতের দেশ ছেড়ে তারা চলে এসেছে, শীতটা তারা গরম দেশের এই বিলটায় কাটিয়ে যায়। যুগ যুগান্ত ধরে প্রকৃতির এই অলিখিত নিয়ম চলে আসছে হাঁসেদের দলে। কত হাঁসের দল এইখানে ডিম পাড়ে, এই-খানে কত তাদের বংশবৃদ্ধি হয়, তারপরে গরম পড়বার মুখেই আবার তেকোণা সারে তারা আকাশে ওড়ে—মেঘের ওপর দিয়ে দলে দলে আবার ছুটে চলে শীতের দেশের অভিমুখে। দলে তাদের যোগ দেয় নতুন বাচ্চাদের সার।

হাঁসের দল বিলে নামার সঙ্গে সঙ্গে বনে আরও সব নতুন আগন্তুকদের দেখা যায় শিকারের লোভে লোভে। রাতে প্যাঁচার দলের চোখ জ্বলে, নিঃশব্দ চরণে শেয়াল ঘুরে বেড়ায়। ডিমের লোভে ওৎ পেতে থাকে ক্রূর সাপ।

এমনি এবারে কালশরীর শরবনে রঙিলা-বৌ এর ছুটি বাচ্চা হয়েছে এইমাত্র সেদিন। বাচ্চারা জন্মাবার আগেই তাদের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। রঙিলা মারা গেল সাপের কামড়ে ডিম-ছুটি ফোটবার দিনই। ডিমছুটিরও সেইদিনই প্রাণ-সংশয় হয়ে উঠে-ছিল সাপের হাতে। দৈবক্রমে সাপটা বেজি-বাচ্চা চিকির সামনে পড়ায় তারা বেঁচে গেল।

প্রথম-প্রথম কচি-কচি ছুটি বাচ্চা নিয়ে রঙিলা-বৌয়ের কত দুর্ভাবনা! কোনদিক থেকে পাজি শেয়াল উঁকি দেয় ঠিক নেই। রাতজ্বলা প্যাঁচার গলার আওয়াজের দিকেও নজর রাখতে হয় তার—রাতে ঘুমিয়েও সুখ নেই!

তারপরে দেখতে-দেখতে বাচ্চাদের নরম নরম রোঁয়াগুলো পূর্ণ হয়ে ডানায় পরিণত হয়ে উঠল—বাচ্চারা এবার উড়তে শিখবে। উড়তে না-শেখা পর্যন্ত রঙিলা-বৌয়ের মনে সুখ নেই। একবার উড়তে শিখলেই বাচ্চারা স্বাধীন। আত্মরক্ষার উপায় তখন ওদের প্রকৃতিগত।

সোনালি সূর্যমুকুটের রশ্মিরেখা তখন পূর্ব-দিগন্তে ছটা বিস্তার করছে। শরবনের ভেতর থেকে রঙিলা-বৌ জেগে উঠে বাচ্চাদের মারল আলগোছে দুটো ঠোকর।

পিঁক পিঁক—পেঁয়াক!—

বাচ্চাদের একটা একেবারে হুবহু মায়ের মত দেখতে। মেটে মেটে রং, ঠোঁটটি কালো, পায়ের পাতাগুলো হলদে—তাকে আমরা বলব বালু। আর-একটা বাচ্চার মাথায় কয়েকটা পালক ঘন কালো। বালি হাঁসদের মধ্যে এমন বড়-একটা দেখা যায় না। মাথায় যেন তার কে এক লম্বা জয়তিলক এঁকে দিয়েছে—নাম তার মরকেতু।

কিন্তু ওই জয়তিলক শুধু দৃষ্টিতেই; বালি হাঁসদের মধ্যে এমন কুড়ে আর বোকা হাঁস প্রায় দেখা যায় না—অন্তত রঙিলা-বৌয়ের তাই মনে হয়।

মায়ের ঠোকর খেয়ে বালু ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল, নতুন ডানা-গুলো তার মেলে ঝটপটিয়ে প্রাভাতিক আলস্য নিলে ভেঙে। মর-কেতুর কিন্তু কোন খেয়াল নেই; সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ডানার মধ্যে ঠোটটি গুঁজে ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই। রঙিলা-বৌ বিরক্ত স্বরে বলে উঠল—নাঃ আর পারা যায় না বাপু!

বিরক্ত হয়ে রঙিলা-বৌ সজোরে তাকে মারল এক ঠোকর।

প্যাঁক প্যাঁক—পেঁয়াক!

মরকেতু গড়িয়ে পড়ল এক দিকে।

চল চল জলে নামি, বেলা হল। বলে উঠল রঙিলা-বৌ। তারপরে হেলতে দুলতে থুপ-থুপ করে এগিয়ে চলল বিলের দিকে।



বালুও মায়ের পেছু নিল। বেচারি মরকেতু আর কী করে? কুঁক-কুঁক করে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে তাকেও পেছু নিতে হল।

দিগন্তবিস্তৃত বিলে যেন কে গলানো রুপো ঢেলে দিয়েছে। মৃদু হাওয়ায় শির-শির করে কাঁপছে জল। এপারে বনের শান্ত শীতল কোমল ছায়া, ওপার অন্তহীন উদাস। মাঝে মাঝে শুকনো শরের মধ্য দিয়ে বাতাস করুণ সুরে কেঁদে যাচ্ছে যেন। পাড়ের ওপর জলের মৃদু মৃদু আওয়াজ—ছপ্—ছপ্—ল্যপ্, ল্যপ্!

এ-সব হাঁসেদের চিরপরিচিত। এর প্রতিটি মৃদুতম কণায়ও জীবন তাদের মেশানো। এই আবহাওয়ায় এসে পড়লে তারা খুশি হয়ে ওঠে, নেচে ওঠে তাদের মন।

রঙিলা-বৌ জলে নেমেই আনন্দ-ডাক ডেকে উঠল—প্যাঁক প্যাঁক! জলের ওপর থেকে দলে-দলে হাঁসের সাড়া এল—প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক! হাঁসেদের আনন্দ-কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল সকালের আকাশ। তারপরে সূর্যের সোনালি আলো যখন জলের বুকে প্রতিচ্ছবিত হয়ে উঠল, হঠাৎ রঙিলা-বৌ ডানা মেলে উঠল আকাশে। উঠেই বাচ্চাদের উদ্দেশে ডাক দিল—আয় আয়! সেই ডাক শুনে বালু ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে উঠল আকাশে, আর পড়ে যেতে-যেতেও ঝটপট করে সামলে নিয়ে, ডানার ঘায়ে বাতাস ঠেলে মায়ের পাশে এল চলে। সেই প্রথম সে বুঝল ডানার শক্তি—বাতাসে ভাসতে ভাসতে তীরের মত এগিয়ে চলল সে।

মরকেতু এদিকে মায়ের আর ভাইয়ের কীর্তি দেখে জলের ওপর থেকে বোকার মত পিঁক পিঁক শব্দ করতে লাগল। রঙিলা-বৌ তার দিকে চেয়ে আবার ডাকল, আয় আয়!

মরকেতুর ওড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রঙিলা-বৌ ছোঁ মেরে নিচে নেমে মারল তাকে এক ঠোকর। মরকেতু চেঁচিয়ে উঠল—পেঁয়াক! তারপর জলের ওপর সাঁতার কাটতে কাটতে জোরে মারল একদিকে ছুট। সাঁতারে মরকেতু খুব ওস্তাদ।

মরকেতু জলের ওপর দিয়ে বিলের এক কোণ লক্ষ্য করে ছুটে

চলেছে, রঙিলা-বৌ আকাশে তাড়া করেছে তাকে আর থেকে-থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারছে ঠোকর। মরকেতু পিঁক পিঁক করে আপত্তি করতে করতে ছুটেছে—সামনের ওই শর-ঝোপটার আড়ালে গিয়ে সে লুকিয়ে পড়বে, এই তার মতলব। শর-ঝোপটার আড়ালে জল তেকোণা হয়ে ডাঙায় গিয়ে ঢুকেছে। দূর থেকেই মরকেতু দেখল, সেখানে ভাসছে কয়েকটা হাঁস!

রঙিলা-বৌ হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করেছিল। এদিকে বেশ একটা মজার খেলা হচ্ছে ভেবে বালু আগে আগে উড়ে চলেছিল। রঙিলা-বৌ মরকেতুকে ঠোকর লাগাতে লাগাতে একটু পেছিয়ে পড়েছিল। তবু আড়চোখে সেই হাঁসগুলোকে দেখে সে সাবধানী একটা ডাক ডেকে উঠল, কারণ তার মনে হল ওই হাঁসগুলো কেমন যেন অসাধারণ। তারা সোজা হয়ে জলে ভাসছে বটে, কিন্তু একবারও জলে ডুবছে না; পুচ্ছগুলো তাদের জলের ওপর উঁচু হয়ে উঠছে না—তাদের জাতের হাঁসেরা তো এমন করে না! রঙিলা-বৌ আবার ডেকে উঠল তার সাবধানী ডাক। কিন্তু বালু ততক্ষণে সেই হাঁসেদের ওপর গিয়ে পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে জলের কিনারা থেকে একটা বন্দুক উঠল গর্জে। তার ধোঁয়াটা মিলিয়ে যাবার আগেই জলের ওপর ঝপাং করে একটা শব্দ হল। বন্দুকের গুলিতে প্রাণশূন্য বালুর দেহ পড়ল জলে লুটিয়ে। রঙিলা-বৌ তারস্বরে চীৎকার করে ছুটল তার দিকে। আবার বন্দুকের গর্জন। আবার জলের ওপর একটা পড়ার শব্দ। রঙিলা-বৌও পড়েছে লুটিয়ে। কালশরীর বিলে নতুন শত্রু এসেছে। কাঠের হাঁস ভাসিয়ে পাকা হাঁস-শিকারীর দল।

মরকেতু ওদিকে প্রথম বন্দুকের আওয়াজ পেতেই অনুভূতির বলে টের পেল বিপদ। তার এই তীক্ষ্ণ অনুভূতিই তার জীবনের প্রধান সম্পদ হয়েছিল একদিন। সে ঝাঁ করে ঘুরে উল্টো দিকে লাগাল ছুট-সাঁতার। তার পেছনে দুটো জলের রেখা শির-শির করে বিদ্যুতের মত ছুটে চলল।

রঙিলা-বৌ কিন্তু মরে নি। বন্দুকের গুলিটা তার ডানায় লেগে

হাড়গুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। জলের ওপর পড়েই একবার চীৎকার করে উঠে প্রাণপণে সে মারল ডুব। তারপরে কিছু দূরে ভেসে উঠে মরকেতুকে লক্ষ্য করে তার পেছু নিল।

আর সেই থেকে কালশরীর বিলে নামল মড়ক। দেখতে দেখতে বন্দুকের গুলিতে কত হাঁস যে মারা পড়ল তার ঠিকানা নেই। শেষে যুগ-যুগান্তরের আশ্রয় কালশরীর বিল ছেড়ে হাঁসেরা পালাতে শুরু করল। দলে দলে হাঁস উড়ে চলল আরও দক্ষিণে ভিন্ন জলায়। দেখতে দেখতে বিল খালি হয়ে গেল—একটি দলও আর রইল না সেখানে। হাঁসেদের জলা হংস-শূন্য হয়ে গেল। শুধু একটা শরবনে লুকিয়ে পড়ে রইল মরকেতু আর রঙিলা-বৌ—একজন তখনও উড়তে শেখেনি, আর একজন চিরজীবনের মত আহত।

মরকেতুর জীবনে সেই শেষ দুর্ঘটনা নয়। কয়েকটা দিন কেটে গেছে। শিকারীরা গেছে চলে। প্রাণীহীন বিল অগাধ, নিথর। সন্ধ্যার রিক্ত ধূসর রক্তিমাভায় প্রকৃতি যেন থমথম করছে। জল ছেড়ে মরকেতু আর রঙিলা-বৌ সবে উঠেছে তাদের শরবনটায়। হঠাৎ শরবনের এক দিক নড়ে উঠল। ভীষণ একটা চীৎকার করে উঠল রঙিলা-বৌ এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভাঙা ডানা ঝটপট করতে করতে লাফিয়ে পড়ল মরকেতুর সামনে। বিদ্যুতের মত কি যেন একটা হয়ে গেল। আচমকা ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটলে মরকেতু দেখল, একটা শেয়াল তার মাকে মুখে করে চলে যাচ্ছে। মরকেতু সভয়ে আর্তনাদ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জলের ওপর দিয়ে ছুটে চলল সে।

তারপরে নিঃসঙ্গ পৃথিবী।

জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভের আগেই মরকেতু অনুভব করল সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা। এতদিন মায়ের ডানার নিচে কেটেছিল তার জীবন। হঠাৎ রুদ্র মূর্তিতে প্রকাশিত হল জীবনের শত্রু। মরকেতু তখনও বাচ্চা। প্রকৃতপক্ষে তার গড়ন শেষ হতে কিছু দেরি হয়েছিল। প্রকৃতি তার কাজ মরকেতুর বেলায় কিছু দেরিতে করতে

শুরু করেছিল—যেন প্রকৃতির কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই নিঃসঙ্গতা থেকেই মরকেতু সংগ্রহ করল বাঁচার একটা গাঢ় ইচ্ছা। নিজের ভার সম্পূর্ণ তার নিজের ওপর পড়ায় অনুভূতি তার হয়ে উঠল আরও তীব্র। শরবনের প্রতিটি শব্দ, জলের শির-শির কাঁপা, প্যাঁচার ডানার সামান্য ঝাপটা তার কাছে হয়ে উঠল অর্থময়। জীবনের নিঃসঙ্গতা তাকে শিক্ষা দিল প্রচুর। আকারেও সে সাধারণ বালি হাঁসেদের চেয়ে বড় হয়ে উঠল। গলার রোঁয়াগুলো উঠল ঝিকঝিকিয়ে, মাথার ঘনকৃষ্ণ জয়তিলক হল গাঢ়তর। তবু শিক্ষা তার সম্পূর্ণ হল না। তখনও সে শিখল না উড়তে, ডানার ব্যবহার রয়ে গেল অজানা।

এদিকে পৃথিবীর বাতাস গেল ঘুরে। উত্তুরে হাওয়ার বদলে ধেয়ে এল দক্ষিণ বাতাস, আকাশে লাগল গরমের হলকা। প্রকৃতি-গত টানে মরকেতুর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে যেন সেই প্রথম বিশেষ করে অনুভব করল জীবনের নিঃসঙ্গতা। বিলের নিথর নিস্তব্ধ জল আকুলিত হয়ে উঠল তার নিরালা ডাকে।

সেদিন ভোরে উঠেই মরকেতু নেমেছে জলে। আনমনা সে ভেসে চলেছে—কোথা থেকে অজানা টানে মন ভারী। ভোরের প্রথম কুয়াসা আবছা সাদা চাদরের মত ঝুলে আছে জলার ওপর। ভোরের আবছা অন্ধকারে অন্তহীন মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা।

হঠাৎ মরকেতু চমকে কান খাড়া করল। মেঘের ওপর হাঁসের ডাক না? মরকেতু চীৎকার করে ডাক দিল—প্যাঁক প্যাঁক—পেঁয়াক!

বাতাস কাঁপতে কাঁপতে ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল তার কানে—প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক! হংস-যূথের জয়যাত্রার স্বর যাযাবর, একাগ্র। বিলের কাঁপা-কাঁপা জলে একদল উড়ন্ত হাঁসের ছায়া পড়ে ভেসে ভেসে মিলিয়ে যেতে লাগল। প্রাণপণে জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠল মরকেতু। ঝপাৎ করে আবার লুটিয়ে পড়ল জলে। আবার লাফ। আবার ঝটপটিয়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ

পাখাত্নটো তার ছড়িয়ে গেল। বাতাসের ঢেউয়ে ভেসে উঠল সে। সে কী অপূর্ব এক স্বাদ! সামনে এগিয়ে-চলা হাঁসেদের জয়ধ্বনি। পৃথিবীর এ কী নতুন রূপ? পৎ পৎ করে পাখা চালিয়ে তীরের মত কোণাচে হয়ে উঠে যেতে লাগল মরকেতু। জলা ছোট হয়ে আসতে লাগল, আর ছড়িয়ে গেল বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী চোখের সামনে।

নতুন পৃথিবী

মাঠের এদিকটা একেবারে অসমতল, আবড়ো খাবড়ো, অজস্র ঢিপিতে ভরা। ঢিপিগুলোর ভেতরটা ঝাঁঝরা, গায়ে চারদিকে নানা আকারের নানারকম গর্ত। মাঠের এদিকটায় খরগোসদের বাসা। কত রকমের খরগোস যে এখানে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ বা ধবধবে দুধের মত সাদা, কারো গায়ে সাদার ওপর নানারকম রঙের ছোপ—হলদে কালো পাঁশুটে বেগুনি বালি রং। খরগোসরা এখানে ঢিপিগুলোর ভেতর শত্রুদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে বাস করে। নিরীহ ছটফটে প্রাণীর দল। তাদের শত্রুর অন্ত নেই। পশু-পাখি, মানুষ, সবাই তাদের শত্রু। তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার কোনরকম অস্ত্র তাদের ঈশ্বর দেন নি। থাকবার মধ্যে আছে শুধু দ্রুত ছোটবার ক্ষমতা। তাই দিয়েই তারা বেঁচে থাকে।

নতুন পৃথিবীর আলো ভারি মিষ্টি, ভারি সরল। মনে হয় জগতে বুঝি সবাই বন্ধু। টুকটুক আর তুলতুলেরও তাই মনে হয়। তারা বুঝতেই পারে না যে মা তাদের কেন এত সাবধানে রাখে। এত বড় মাঠ, এমন মিষ্টি হলদে আলো, এমন দিগন্ত ছড়ানো সবুজ ঘাসের গালচে, তবু তারা প্রাণ ভরে ছুটোছুটি করতে পায় না, খেলতে পায় না। মা-টা যেন কী! সেদিন ভোরবেলা সুয্যি-ঠাকুরের সোনালি আলো মাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, ঘাসের ডগায় ডগায় শিশিরের নোলক দুলছে টুলটুল, ঝরে পড়ছে টুপটুপ। টুকটুক তুলতুলকে বলল —চল ভাই, এক ছুট লাগাই।

তুলতুল বলল—দেখ দেখ ওদিকটা কেমন সুন্দর!

চল না যাই! চপলার মত চোখ দুটো টুকটুকের ছটফট করে উঠল।

তাদের মা একটুখানি দূরেই কচি ঘাসের ডগাগুলো কুটকুট করে

কেটে খাচ্ছিল। সাদা লোমে ঢাকা শরীরটা তার থর-থর করে কাঁপছে, চোখদুটো সব সময় নড়ছে এদিক ওদিক, এদিক ওদিক। কখন কোথা থেকে যে শত্রু আসে বলা যায় না। পাজি শেয়ালগুলো ভারি ধূর্ত, আর খরগোসের মাংস ছাড়া যেন কিছু তাদের মুখে রোচেই না। টুকটুক আর তুলতুল তখন কাছাকাছি গায়ে গায়ে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে—যেন দুটো তুলোর সাদা বল। চুপি-চুপি তারা একবার মায়ের দিকে তাকাল। কানগুলো তাদের শূন্যে খাড়া হয়ে উঠেছে। এই ছুট মারল বলে। হঠাৎ মা তাদের বলে উঠল—খবরদার টুকটুক!

হুস্ হু-উ-স্...

শিগগির গর্তে ঢুকে পড় তুলতুল, শিগগির! খরগোস-মা ঝাঁ করে একটা গর্তে ঢুকে পড়ল, পেছনে তার তুলতুল আর টুকটুক।

হু-উ-স্ করে মাথার ওপর দিয়ে কি যেন একটা বেরিয়ে গেল। টুকটুক জিজ্ঞেস করল—কী মা?

প্যাঁচা, লক্ষ্মী প্যাঁচা! ওদের ডানায় ওইরকম শব্দ হয়। শিখে রাখ, বুঝেছিস? ওই শব্দ শুনলেই গর্তে ঢুকে পড়বি।

প্যাঁচা কী করে?

গর্তের আর-একটা মুখ থেকে দলের বুড়ো খরগোসটা চুপি-চুপি মুখ বার করে এদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছিল। বয়সে তার গায়ের লোম হলদে হয়ে এসেছে। সে জিজ্ঞেস করল—কী গা খরগোস-মা, ছেলেরা কী বলছে?

খরগোস-মা হেসে জবাব দিল—ছেলেরা জিজ্ঞেস করছে প্যাঁচা কী করে।

প্যাঁচা? ওরে বাবা, প্যাঁচা কোথায়?

এই তো মাথার ওপর দিয়ে একটা চলে গেল।

তাই নাকি? ওরে বাবা, খুব সাবধান বাছারা! প্যাঁচাগুলো মহা শয়তান, খাঁড়ার মত বাঁকা ঠোঁট লোহার মত শক্ত। তার একটি ঠোকর লাগলেই সাবাড়! একেবারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। তারপর খরগোস-গিন্নি, আর সব খবর-টবর কী?

আর বল কেন ঠাকুর্দা! ঘাস খেয়ে খেয়ে তো অরুচি ধরে গেল! বাছাদেরও যে মিষ্টি নতুন কিছু খেতে দেব তারও জো-টি নেই।

তা বাছা বলেছ ঠিক। চাষারা ওদিকে ক্ষেতে কপি লাগিয়েছে, কিন্তু শেয়াল আর প্যাঁচাগুলোর জ্বালায় কি বেরোবার জো-টি আছে?

বুড়ো খরগোস খুটখুট করে ঘাসের ঝোপে এগিয়ে গেল। টুকটুক জিজ্ঞেস করল—কপি কী মা? কী রকম খেতে?

কপির নামে খরগোস-গিন্নিরও জিভে জল ঝরছিল, সে বলল—নরম নরম কপির পাতা, সে ভারি মিষ্টি!

চল না মা খেয়ে আসি।

আজ নয়, আর-একদিন যাব।

কোথায় চাষাদের ক্ষেত, মা? কতদূর? তুলতুল জিজ্ঞেস করল।

ওই তো মাঠের উত্তরে।

সূর্যের আলোর তেজ বাড়ছে। মাঠের ওপরের শীত কুয়াসা হয়ে ঝিমঝিম করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। বেলা বাড়ছে। এই সময়টায় সকালের আহারের পর প্রাণী-জগতের বিশ্রামের সময়। তুলতুল আর টুকটুক গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছে।

তুলতুল বললে—ওমা, মা!

খরগোস-গিন্নির ঝিমুনি আসছিল, বলল—কী? এত বকবক কেন? একটু ঘুমো দিকিনি!

খরগোস-গিন্নি ঝিমুতে শুরু করল। সেই সময়ে শীতকালের একটা দমকা বৃষ্টি নামল মাঠের ওপর ঝমাঝম। মুহূর্তের মধ্যে সূর্য গেল ঢেকে, আর মাঠের ওপর কোন মায়াবী যেন একটা আবছা অস্পষ্ট চাদর চেপে দিল। মাঠের অসীম বৃত্তটা ঢেকে গেল তার আড়ালে। তারপরে দমকা বৃষ্টি যেমন হুমকি দিয়ে এসেছিল তেমনি মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। ভিজে মাঠ নেয়ে উঠে ভারি-একটা-মজা-হল মতন খিলখিল করে হেসে উঠল।

খরগোস গিন্নি ঝিমুচ্ছে তো ঝিমুচ্ছেই। বৃষ্টির অদ্ভুত খেয়াল-খেলাটা টুকটুক আর তুলতুল ভারি উপভোগ করল। তাদের মনও ওই খেয়ালী বর্ষার মত চঞ্চল। টুকটুক ডাকল—এই!

কি?

মা তো ঘুমুচ্ছে!

হ্যাঁ।

চল না যাই!

কোথায়?

কপি ক্ষেতে!

কিন্তু প্যাঁচা?

দূর বোকা, কান খাড়া করে শোন দেখি, শুনতে পাচ্ছিস প্যাঁচার ডানার আওয়াজ?

না।

এই বৃষ্টির সময় সবাই ঘুমুচ্ছে এখন, প্যাঁচাই হোক আর যেই হোক। চল, যাবি?

হ্যাঁ!

তবে চুপি চুপি আয়!

দুজনে চুপি চুপি গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এল। সাবধানে দেখে নিল চারিদিক। কেউ কোথাও নেই।

চল ছুট লাগাই।

দুটো সাদা বিদ্যুৎ যেন সবুজ মাঠে ঝলসে গেল। মাঠের উত্তর-মুখো ছুটল তারা।

হিজল গাছের পাতা বেয়ে বৃষ্টিশেষের জল ঝরছে টুপটাপ। শীতের বাতাস কনকনে। পাতাগুলোর ফাঁকে বসে প্যাঁচা ভিজে জুবড়ি হয়ে কাঁপছে। খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে খাবার তো জুটলই না, অধিকন্তু শীতে ভিজে হি-হি। খাবার যেন আজকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। নাহলে প্যাঁচা রাত ছাড়া বেরোয় না; কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা বড় জ্বালা! খরগোসগুলোও আজকাল বেজায় চালাক হয়ে



গেছে। যদি-বা একটু আগে দেখা গেল বাচ্চা খরগোস, কিন্তু নিমেষে হাওয়া! প্যাঁচা ভাবল, নাঃ এখানে আশা নেই, দেখা যাক চাষাদের ক্ষেতে দু-একটা মেঠো ইঁদুর-টিঁদুর পাওয়া যায় কি না। গায়ের পালকগুলো ঝেড়ে নিয়ে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে মেলে দিল তার পাখা। তারপরে হুস-হুস করে উড়ে চলল চাষাদের ক্ষেতে।

ছোট্ট একটা নদী, শিরশির করে তার জল বয়ে চলেছে, জলের ওপর পা ডুবিয়ে ধার্মিক বক বসে আছে নিথর নিস্পন্দ। বক যেন নদীর কুলের ওই লম্বা লম্বা ঘাসগুলোরই একটা। নদীর জলে একটা রুপোলি চমক, টুপ করে ছোঁ মেরেছে। একটা মাছ উঠে এল তার ঠোঁটে। মুহূর্তের মধ্যে মাছটা বকের পেটে। বক আবার মহা ধার্মিকের মত নিথর নিস্পন্দ। হঠাৎ পেছনে ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ একটা শব্দ। চকিতে বিদ্যুতের মত ডানা ছড়িয়ে বক লাফিয়ে উঠল শূন্যে। জলে ঝপাং করে শব্দ হল। ব্যর্থ ক্রোধে শিয়াল চেঁচিয়ে উঠল—হুয়া হুয়া হুয়া!

এতক্ষণ সে কত সাবধানে বকটাকে লক্ষ্য করে পা টিপে টিপে এগিয়েছে, কিন্তু বকগুলো এমন চালাক! ওদিকে নদীর গা ঘেঁসেই চাষাদের ক্ষেত: সেখানে টুকটুক আর তুলতুল মহানন্দে কপির পাতা চিবুচ্ছিল। টুকটুক বলল—এমন খাবার আর খাইনি, না রে?

কী মিষ্টি! জবাব দিল তুলতুল।

ঠিক সেই সময় নদীর ধারে শেয়ালের ডাকে তারা চমকে উঠল।

ও দাদা ও, কী? তুলতুল বলল।

এই রে, শেয়াল! সভয়ে টুকটুক বলল।

আমার ভয় করছে, মার কাছে যাব!

চুপ চুপ! একটুও শব্দ করিস নি! চুপ করে বসে থাক! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পরস্পরের সান্নিধ্যের উত্তাপে চুপ করে বসে রইল তারা। সময় বয়ে চলেছে অধীর গতি। আর সমস্ত বস্তুজগৎ থেমে গেছে যেন। অনেকক্ষণ বসে বসে আর শেয়ালের কোন সাড়া না

পেয়ে তাদের মনে আবার সাহস ফিরে এল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পাতা চিবুতে শুরু করল তারা।

শেয়াল কিন্তু যায় নি। সে জানে ক্ষেতে নানারকম জানোয়ার আসে। সেখানে একটা-না-একটা শিকার মিলবেই। তার তো আর পায়ে চলার শব্দ হয় না, নিঃশব্দে সে পাতার ফাঁকে ফাঁকে চুপি-চুপি এগোচ্ছিল। হঠাৎ তার কানে এল—কুটুর কুটুর কুটুর! আরে, এ আওয়াজ সে খুব চেনে! এ খরগোস না-হয়েই যায় না। শেয়াল গুঁড়ি মেরে বসে যেদিক দিয়ে শব্দ আসছিল সেদিকে তাকাল। কী বরাত! দুটো বাচ্চা খরগোস! তার জিভে জল এল। খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে এল সে। তার শরীরের পেশীগুলো টান হয়ে উঠল। টুকটুক আর তুলতুল জানে না যে মৃত্যু তাদের পাঁচ হাত দূরেই রুখে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক সেই সময় ইঁদুরের খোঁজে প্যাঁচা এসে পড়ল ক্ষেতের মাথায়। আরে, ওদুটো কী? খরগোস? তাই তো, ওই দুটো খরগোসের বাচ্চা তাকে সকালে ফাঁকি দিয়েছে! কিন্তু এবার? প্যাঁচা হুস করে ছোঁ মারল।

টুকটুক চমকে উঠল। তার তীক্ষ্ণ কানে প্যাঁচার ডানার শব্দ এসে লেগেছে। সে চেঁচিয়ে উঠল—ছোট তুলতুল, প্যাঁচা! শিগগির!

এক লাফে দুজনে দুদিকে ঠিকরে গেল। শেয়ালও তাদের লক্ষ্য করে লাফ মেরেছে সেই মুহূর্তে। সব ঘটে গেল বিদ্যুতের মত। একতিলের জন্য বেঁচে গেল টুকটুক আর তুলতুল। প্যাঁচা আগে ছোঁ দিয়েছিল, সে একটা তীরের মত এসে পড়ল মাটিতে আর সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল তার ওপর। প্যাঁচার তীক্ষ্ণ মৃত্যুকাতর চীৎকারে শান্ত আকাশ যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল। শেয়াল প্রথমটায় ভীষণ চমকে গিয়েছিল। দু-দুবার শিকার ফসকে তার রাগে জ্ঞান ছিল না। পায়ের নিচে কী, সে দেখে নি; কিন্তু রাগে সেটাকে সে তখন ফালা-ফালা করে ফেলেছে। তার পরে দেখে, পাখি, একটা প্যাঁচা।

যাক, খাবার জুটেছে। সেটাকে মুখে করে নিয়ে নদীর পানে সে এগোল। আর টুকটুক আর তুলতুল ততক্ষণে হাওয়ার মত ছুটে বাসায় পৌঁছে গেছে। তাদের কানে তখনও বাজছে সেই শেয়াল আর প্যাঁচার ক্রুদ্ধ গর্জন, তার পরে মৃত্যুকাতর চীৎকার। মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মরণকে চিনেছে তারা। টিপির গর্তের মধ্যে ঢুকে কাঁপুনি আর তাদের থামে না! মায়ের অনেকগুলো সাবধানী কথার মানে তারা বুঝেছে। যুদ্ধময় জীবনের রূপ নতুন করে ফুটে উঠেছে তাদের চোখে। অথচ পৃথিবী তেমনিই সুন্দর। প্রতিদিনের মতই পশ্চিম আকাশ উদাস মধুর লাল হয়ে উঠেছে। সুয্যিঠাকুর মাঠের ওপারে মুখ লুকোবার জোগাড় করছে, সারা মাঠ আর আকাশ সবুজে লালে নীলে মিশে ঝিম-ঝিম-রিম-রিম।

———

ডিউক আর লালু

ঝকঝকে তকতকে প্রকাণ্ড বাড়ি। তার মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতে ডিউকের ভাল লাগে না। অনেক আদর, অনেক যত্ন, তবু তার কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগে। সঙ্গী নেই সাথী নেই, কি যেন। খোকা যখন তার সঙ্গে খেলতে নামে সেই সময়টুকু অবশ্য বেশ, কিন্তু সেটা কতটুকু? তার দুঃখটা কেউ বোঝে না। ভোর বেলা তার কাঠের ছোট্ট ঘরটার মধ্যে ভোরের মিষ্টি আলো এসে যখন ঢোকে, সে চোখ মেলে মিট মিট করে চায়, মনে হয়, দিনটা আজ কী সুন্দর! সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে, সামনের আর পেছনের পাগুলো টান করে ডন দেবার ভঙ্গীতে আড়ামোড়া ভেঙে নেয়, তার পরে মুখটা উঁচু করে ডাক ছাড়ে—ভু-উ-ভৌ! খোকা, উঠেছ?

খোকা তখন ভোরের নিদ্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, সাড়া দেবে কী?

ডিউকের বয়স অল্প। কানগুলো ঝোলা ঝোলা, শরীরে বড় বড় লোম, চোয়ালটা দৃঢ়, কঠিন হয়ে উঠছে। সে ভেবেই পায় না মানুষগুলো এত ঘুমোয় কেন! সূর্যঠাকুর আকাশে উঠলেই তো ঘুম ভেঙে উঠে পড়তে হয়। সেই সময়টা তার সবচেয়ে বেশি লাফালাফি ছুটোছুটি করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সঙ্গী নেই, সাথী নেই। খোকা সেও ঘুমুচ্ছে। সেদিনও ঘুম থেকে উঠে তার ছোট্ট কাঠের ঘরটা ছেড়ে বাইরে এসে সে হাঁকল—ভু-উ-ভৌ—খোকা, ও খোকা, ওঠো না! বলটা নিয়ে এসো না!

কোথায় বা খোকা আর কোথায় বা কে!

একটা মাছি তার ঘরের খড়গুলোর উপর ভন ভন করে ঘুরে মরছিল। ডিউক কাজের অভাবে মাছিটাকেই এক ধমক দিল—ভো-ও-ভোঃ! এই, ও কি হচ্ছে?

মাছি সে কুকুরের কথা বুঝবে কেন? সে বোঁ বোঁ করতে করতে একবার এখানে একবার ওখানে উড়ে উড়ে বসছে। ডিউক বলল—ভোঃ ভোঃ! শোনা হচ্ছে না?

মাছি বেপরোয়া। চটে-মটে ডিউক মাছিটার উপর মারল এক থাবা। মাছি এতটুকু প্রাণী, তাকে সে ধরতে পারবে কেন? ফস করে উড়ে এসে মাছিটা ডিউকের ল্যাজের উপর বসল। ডিউক মাছিটার বেয়াদবীতে অবাক হয়ে বলে উঠল—ভুঃ ভুঃ ভৌ! এই, যা না! লেজ নাড়া দিল সে। মাছিটার খেয়ালই নেই। এবার ক্রুদ্ধ গলায় সে ডাক ছাড়ল—ভৌ ভৌ! চালাকি হচ্ছে?

তবুও মাছিটা যায় না। তখন শরীরটা দুমড়ে নিজের ল্যাজটা কামড়াবার জন্যে সে পাক খেতে লাগল। কিন্তু ল্যাজ পর্যন্ত মুখ পৌঁছায় না, অনবরত চরকি-পাক খাওয়াই সার। শেষে মাছিটা ল্যাজ নেড়ে উপরে উঠল। ডিউক তাকে লক্ষ্য করে মারল এক লাফ শূন্যে। মাছিটা দ্বিধাহীন ভাবে উড়ে চলে গেল। তখন খুশি হয়ে ডিউক হেসে উঠল—ভোঃ ভোঃ ভোঃ! দুয়ো দুয়ো, পালিয়ে গেল!

যাক, মন্দ খেলা হল না। কিন্তু মাছি, সেও রোজ সকালে থাকে না।

খোকা ততক্ষণে মুখ হাত ধুয়ে খাওয়ার টেবিলে বসেছে, ডিউক ছুটল সেখানে। খোকাকে দেখেই আনন্দে সে ডেকে উঠল-ভৌ ভৌ!

আয় ডিউক! খোকা ডাকল।

ডিউক এক লাফে খোকার কোলে।

লক্ষ্মী ডিউক, সোনা আমার!

ডিউক বলল—ভৌ ভৌ। চলনা খেলি।

খোকা খাওয়া সেরে উঠছিল, ডিউক তার প্যাণ্টটা কামড়ে টান দিল-ভৌ ভৌ—

আঃ ছাড় ছাড়, এখন পড়তে যাব।

ভুঃ—নাঃ।

খোকা প্যাণ্ট ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। ডিউক মন-মরা হয়ে এক লাফে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তার ভারি খেলতে ইচ্ছে করছে, ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেউ নেই। আবার লাফাতে লাফাতে নেমে এল সে। খোকার পড়বার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে মুখটা বার করে চুপি চুপি বলল—ভুঃ! এস না পালিয়ে এস খেলি!

যা ডিউক আমি পড়ছি এখন।

ভুঃ ভুঃ! আরও অনুরোধ করে মিষ্টি গলায় সে বলল।

যা যা, এখন জ্বালাতন করিস নি, আমার পরীক্ষা।

ভোঃ! ওঃ ভারি, খেলবে না তো বয়ে গেল।

ডিউক রাগ করে চলে এল। কী যে একটা বই খুলে গোটা-কতক ইকড়ি-মিকড়ি শব্দ উচ্চারণ করা—কোন মানে হয় না। ওরকম শব্দ সে ঢের করতে পারে। আকাশে মুখ তুলে সে একবার শুনিয়ে দিল—ভো-ও-ভু ভুঃ—ভৌ-ও ভৌ ভৌ!

রাগ করে ডিউক লাফাতে লাফাতে একেবারে বাইরের লনে চলে এল। প্রকাণ্ড লন। সামনে চওড়া রাস্তা। দক্ষিণের এ পথে গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় বেশি কেন, প্রায় নেই বললেই হয়। আরও ওদিকে লোকের ওপর সুয্যিঠাকুরের মিষ্টি রোদ ঝকমক করছে। আনমনা হয়ে ডিউক গেটের সামনে এসে পড়ল। তার চোখদুটো চঞ্চল, এদিক ওদিক ঘুরছে। ঠিক সেই সময় ডিউক দেখল, রাস্তা দিয়ে তারই বয়সী একটা কুকুর চলেছে।

ডিউক ডাকল—ভোঃ ভোঃ! এই, এই!

কুকুরটা থমকে দাঁড়াল, জবাব দিল গর্র্র্!

ভু ভু! রাগ করিস না ভাই? আয় না!

কুকুরটা জবাব দিল—ভো-ও! কেন?

আয় না খেলি!

ভোঃ ভোঃ! চলেছি খাবারের সন্ধানে এখন।

আয় না, এখানে ঢের খাবার পাওয়া যায়।

সত্যি? কিন্তু যদি মারে?

দূর খোকা খুব ভাল। কেমন বল খেলে!

কুকুরটা জিজ্ঞেস করল—খাবার পাওয়া যাবে তো?

হ্যাঁ, রে হ্যাঁ!

কুকুরটা গেটের ভেতর দিয়ে লনে এসে ঢুকল। দেখতে মন্দ নয়। ডিউকেরই সমবয়সী। সমস্ত গা সাদা, মাথার ওপর একটা পাঁশুটে ছোপ, কানগুলো খাড়া খাড়া। শরীরে ধুলো মাখা, তাই রং ময়লা।

ডিউক বলল আমায় ধর দিকিনি! বলেই ছুট। কেয়ারি করা ফুলবাগানের ওপর দিয়ে, লাল কাঁকরের পথের উপর দিয়ে মাঠময় ডিউক ছুটে বেড়াতে লাগল, পেছনে সেই কুকুরটা। এক সময় ঝাঁ করে সে ডিউকের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপরে ভো-ও-ভৌ ভৌ। ভু-ভু-উ-কুঁ কুঁ।

ধরে ফেলেছি, হ্যাঁ হ্যাঃ!

তোর নাম কী ভাই? আমার নাম ডিউক।

আমার নাম নেই।

সেকি? তবে কী বলে ডাকব?

জানি না।

আচ্ছা আমি তোকে লালু বলে ডাকব। আজ থেকে তুই আমার বন্ধু। কী বলিস?

আচ্ছা।

ঠিক সেই সময় পাঁচিলের গোড়ায় একটা শব্দ। ডিউক বলল—ওইরে, একটা বেরাল!

লালু বলল ধর ধর!

বেরালটাকে তাড়া করল তারা। বেরালটা প্রথমে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—ফ্যাশ্‌শ্‌। আঁচড়ে দেব।

ওরে, আঁচড়ে দেবে!

হোঃ হোঃ!

তারা আবার তেড়ে গেল। বেরালটা ল্যাজ তুলে ছুট। মহানন্দে ডিউক আর লালু ছুটল তার পেছনে। লনের এদিক থেকে



ওদিকে এসে দেয়াল লক্ষ্য করে বেড়ালটা মারল এক লাফ। এক লাফে একেবারে দেয়ালের ওপর। লালু আর ডিউক থমকে দাঁড়াল। বেরালটা ততক্ষণে দেয়ালের ওপারে হাওয়া। ডিউক বলল—ভো-ও-ও! হুয়ো, পালিয়ে গেল!

লালু হেসে উঠল – ভোঃ ভোঃ ভোঃ!

ডিউক যোগ দিল – হোঃ হোঃ হোঃ!

ভোঃ ভোঃ ভোঃ!

হোঃ হোঃ হোঃ, কী মজা!

ঠিক সেই সময় খোকার বাবা বেরিয়ে এলেন—আঃ এত গোলমাল কিসের? আবার একটা নেড়ি কুত্তা জুটল কোথা থেকে।

বলেই বেরিয়ে এসে তিনি লালুকে মারলেন এক স্যুট। কেঁউ করে গিয়ে লালু একদিকে ছিটকে পড়ল। ডিউকের কলার ধরে টানতে টানতে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন। ডিউক কুঁ কাঁ কোঁ করে অনেক আপত্তি জানাল, অনেক বোঝাতে চাইল যে লালু ভাল লালু আমার বন্ধু; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

লালুর পথের জীবনে এমন সুন্দর দিন কখনও আসেনি। পথে ময়লা-ফেলা টিনের ধারে সেই একটুকরো হাড় নিয়ে আরও দশটা বুড়ো বুড়ো কুকুরের সঙ্গে ঝগড়া। শুধু ঝগড়া আর মারামারি। তারা কেউ বন্ধু নয়, হতে পারে না। তারা কেউ ডিউকের মত সুন্দরও নয়। বন্ধু যদি-বা জুটল, কিন্তু রইল না। মানুষগুলো এমনিই অবুঝ। গেটের বাইরে এসে লালু পাঁচিলের পাশে দুঃখিত মনে অনেকক্ষণ বসে রইল। বাইরে জাম গাছের মাথায় রোদ ঝিমঝিম করছে। গাছের ছায়ায় একটা ভিখিরি হাঁড়ি চড়িয়েছে। পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে ওধারে। উদাস মনে সে ভাবল, ওই পথে আবার তাকে যেতে হবে ঘুরে মরতে—আবার সেই জীবন-যুদ্ধ। গা-টা ঝাড়া দিয়ে সে উঠল, এমন সময় পেছনে—ভুঃ ভুঃ!

চমকে লালু ফিরে দেখে গেটের ওপারে ডিউক দাঁড়িয়ে আছে,

তার মুখে একটা মাংসের টুকরো, দুষ্টুমি মাখান চোখ-দুটো চঞ্চল। মাংসটা ফেলে দিয়ে ডিউক বলল—এই নে।

একলাফে এসে লালু মাংসটা কুড়িয়ে নিল। যেতে যেতে সে বললে—মারল কেন রে?

কী জানি ভাই! মানুষগুলোর মাথায় কোন বুদ্ধি নেই!

বাবুটা ভাল নয়।

না রে ভাল, আমায় কত আদর করে।

ভাল না ছাই! আমার গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

না, সত্যি ভাল।

কক্ষনো নয়।

নিশ্চয় ভাল।

হাতি!

দেখ, খারাপ বোলো না বলছি!

নিশ্চয় বলব!

দাঁত বার করে ডিউক বলল—খ্‌খ্‌ ভোঃ!

লালু বলল—গর্‌র্‌র্‌।

গেটটা বন্ধ না থাকলে ডিউক তখনই লালুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ত, লালুও ছেড়ে কথা কইত না। কিন্তু গেট বন্ধ, তাই খানিক ক্ষণ গরগর করে ডিউক বাড়ির ভেতর চলে গেল। কি হতে কী হয়ে গেল। দুঃখিত মনে লালু পথের পানে পা বাড়াল।

সন্ধেবেলা দুঃখিত মনে ডিউক তার ঘরটার সামনে বসে ছিল। সে বেড়িয়ে এসেছে বটে, কিন্তু চেনে বাঁধা হয়ে তার বেড়াতে ভাল লাগে না। দিন আজ শুরু হয়েছিল চমৎকার, সে ভাবল। আহা লালু যদি এখানে থাকত! কেন যে তারা ঝগড়া করল! ঠিকই তো, মার খেলে কি কারো ভাল লাগে? আর কি লালু কখনও আসবে? ঠিক সেই সময় গেটের কাছে সে শুনল—ভুক্ ভুক্!

ডিউক লাফিয়ে উঠল—দেখে, লালু গেটের কাছে দাঁড়িয়ে লাজুকের মত তার বেঁড়ে ল্যাজটা নাড়ছে।

ভো ভোঃ, ডিউক ডেকে উঠল – আয় আয়!

লালু ভেতরে এল।

রাগ করেছিস?

না।

এমন সময় খোকার বাবা আপিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, লালুকে দেখেই বলে উঠলেন—আরে! সেই নেড়ি কুত্তাটা আবার এসেছে! তিনি লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলেন, কিন্তু ওই পা লালু সকালে খুব চিনেছে। সে কি আর দাঁড়ায়? তবু পালাতে পালাতে সে শুনল, ডিউক বলছে – অনেক রাত্তিরে আসিস ভাই, তখন আমরা গল্প করব, তখন কেউ দেখতে পাবে না।

অনেক রাত্তিরে তাই লালু আবার এল। তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের লনে তার ছোট কাঠের ঘরটায় ডিউক গা এলিয়ে দিয়েছে। মাথার ওপর কালো আকাশে হিরের কুচি তারারা ঝলসাচ্ছে। সেই সময়ে লালু এসে চুপি চুপি বলল—ভুক্!

ডিউকও কান খাড়া করে ছিল, সে বলল চুপি চুপি—ভুঃ ভুঃ! আয়, তোর জন্যে একটা মাংসর টুকরো রেখেছি।

লালু গেটের ফাঁক দিয়ে গলে ভেতরে এল। তারপর করবী ঝাড়টার অন্ধকারে বসে দুজনে অনেক গল্প শুরু হল। অনেক সুখ-দুঃখের কথা। নতুন বন্ধুত্বের ফাঁক দিয়ে কত যে সময় বয়ে গেল কারও খেয়াল নেই। গায়ে গায়ে ঘেঁসে বসেছে তারা। শরীরের উত্তাপে ঘন নিবিড়। পুব থেকে পশ্চিমে তারারা হেলে গেল, তখনও তাদের কথার শেষ নেই। হঠাৎ এক সময়ে ডিউক চমকে উঠল – ও কিসের শব্দ?

লালু বলল—কই?

ঠিক সেই সময়ে তারা দেখে, একটা মিশকালো লোক পিঠে একটা বোঁচকা নিয়ে চুপি চুপি ভেতরের পাঁচিল বেয়ে নেমে এল। ডিউক রাগে গর-গর করে উঠল—ওরে! চোর, চোর!

ডিউক আর দাঁড়াল না, একলাফে গিয়ে চোরটার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল। চোরটা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, তারপরে বোঁচকাটা ফেলে হাতের লাঠিটা দিয়ে ডিউকের মাথায় দিল এক প্রচণ্ড বাড়ি। ডিউক চীৎকার করে উঠে আবার লাফিয়ে পড়ল চোরটার ওপর; আবার লাঠির ঘা। মার খাওয়া ডিউকের অভ্যাস ছিল না, কয়েকটা লাঠির ঘায়েই সে কাবু হয়ে পড়ল। এদিকে লালু এতক্ষণ এতে যোগ দেয়নি। খোকার বাবার ওপর তার রাগ তখনও শান্ত হয়নি। কিন্তু বন্ধুর গায়ে লাঠি পড়তে দেখেই সে লাফিয়ে উঠে ক্রুদ্ধ এক গর্জন ছাড়ল—গর্‌রর্‌র্‌! তারপরে মরিয়া হয়ে এসে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল চোরটার ওপর। তার পায়ের গোড়ালিতে সাঁড়াশির মত কামড়ে ধরল। চোরটাও চীৎকার করে প্রাণপণে পিটতে লাগল তাকে। কিন্তু লালু পথের কুকুর, মার খাওয়া তার ঢের অভ্যেস আছে, তাছাড়া তার রক্ত তখন ফুটছে। মরিয়া হয়ে সে কামড়ে পড়ে রইল চোরের পা।

এদিকে গোলমালে বাড়ির লোক জেগে উঠে হৈ-হৈ করে ছুটে এল। একটা কলরব উঠল—চোর, চোর!

খোকার বাবা বলে উঠলেন—সাবাস ডিউক!

খোকা বলল—বাবা ও তো ডিউক নয়!

তবে? আরে তাই তো! ওটা যে সেই নেড়ি কুত্তা! কিন্তু যেই হোক, আজ থেকে ওর ডিউকের সমান আদর।

তারপরে? চোরের যা হল, সে আর কহতব্য নয়। আর ডিউক আর লালু আজকাল একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে খায় দায় একসঙ্গে বেড়ায়। তাদের আর ছাড়াছাড়ি করাবার কেউ নেই, যতদিন না মৃত্যু স্বয়ং তাদের ছাড়াছাড়ি করিয়ে দেয়।

———

শেয়াল-ভাগ্নে

ভর সন্ধেবেলা। বনের পশ্চিমটা টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে। লম্বা ঘাসগুলো বাতাসে দুলছে। তারই একটা ঘন জায়গায় বাঘ ঢুকে গর-গর করে বলল—নাঃ, ওই পাজিটার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখা হবে না!

বাঘিনী তার সাদা পেটটা সবুজ ঘাসে ঢেলে দিয়ে শুয়ে ছিল। সে জিগেস করল--কার কথা বলছ গো?

ওই পাজি শেয়ালটা।

কেন, আবার কী করল?

আর বাকি কী করবে? মানুষের সমাজে কি মুখ দেখাবার জো রেখেছে?

তোমার ওই সোনা মুখটা বুঝি মানুষে খুব আদর করে দেখে? —বাঘিনী হেসে জিগেস করল।

বাঘ বলল—আহা শোনই না। মানুষের ছানাগুলো-শুদ্ধ আজ-কাল জেনে গেছে শেয়াল কী করে আমাদের ঠকিয়েছে। মানুষ-গুলোও যেমন!

বাঘ ঘেন্নায় একটা ঘড়-ঘড় শব্দ করল।

তারা আবার বইয়ে সে কথা লেখে! কেন বাপু? লেখ না আমাদের গায়ে কত জোর! তা নয়, কেবল ওই পাজি শেয়ালটার কত বুদ্ধি, কী করে জানোয়ার ঠকায়, খালি সেই সব! নাঃ, ও পাজিটার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নয়!

বাঘ তার প্রকাণ্ড থাবাটা চাটতে লাগল।

তারপর দিন যায় সুখে দুঃখে। শীত গিয়ে বসন্ত এল, বন ফুলে ফুলে ভরে গেল, বাঁশঝাড়ে টিয়াপাখিদের কলরব। বাঘিনীর দুটো

ছানা হল ছোট্ট ছোট্ট নরম তুলতুলে, গায়ে হলদে হলদে ছোট-ছোট বুটি।

বাঘিনী একদিন বলল—আহা, আমার বাচ্চারা কেমন মিষ্টি! এমন ছানা আর কারো হয় না! বুঝেছ গো, বাছাদের অন্নপ্রাশনের দিন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের খাওয়াতে হবে। কী কী হবে বল তো? হরিণের মাংস, হাঁসের কচি হাড়, আস্ত খরগোস···

বাঘ জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটতে চাটতে বলে উঠল—আহা হা হা!

বাঘিনী বলেই চলল—সারসের ঠ্যাং, পাঁঠার মুড়ি—

পাঁঠা আবার কোথায় পাওয়া যাবে?—বাঘ বলে উঠল।

কেন, জোগাড় করতে পারবে না? পাঁঠা কিন্তু চাই।

বাঘ বলল—হুঁ! পাঁঠার খবর জানে ওই পাজি শেয়ালটা, কিন্তু ও-পাজিটাকে কিছুতেই বলা হবে না।

বাঘিনী বলল—তা কি হয়! হাজার হোক জ্ঞাতি তো! এমন সুখের দিনে কি ওকে বাদ দেওয়া যায়?

দেখতে দেখতে বাঘের ছানাদের অন্নপ্রাশনের দিন এসে পড়ল। সুন্দরবন থেকে এল ইয়া কেঁদো কেঁদো বাঘ, গুজরাট থেকে বুটিদার চিতা, হিমালয়ের মিশকালো বাঘ, বন-বেরাল, ভাম, আরও কত কি। শেয়ালও এল শেষকালে।

শেয়াল এসে বলল—কী মামী, পাঁঠার জোগাড় হয়েছে তো?

বাঘিনী বলল—না বাবা, আর সব হয়েছে ওইটি কিন্তু তোমাকে জোগাড় করে দিতে হবে, তুমি হলে আমাদের আপন জন, আপনার লোক!

গোঁফ চুমরে, ল্যাজ ফুলিয়ে শেয়াল জবাব দিল—তুমি কিছু ভেব না মামী, আমি সব জোগাড় করে দেব। শুধু বাঘা মামাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে।

বাঘিনী একগাল হেসে মুলোর মত দাঁত বার করে বলল—নিশ্চয়, নিশ্চয়॥

বনের পারে চাষীদের ঘর, তার পাশে ক্ষেত খামার। ঘরের লাগোয়া খোঁয়াড়। খোঁয়াড়ে ছাগলেরা ঘুমুচ্ছে। রাত নিশুতি। বাঘকে পথ দেখিয়ে চুপি চুপি শেয়াল সেখানে নিয়ে এল।

মামা, ওই যে খোঁয়াড়, ঝাঁ করে ভেতরে লাফিয়ে পড়। তার পরে একটা করে পাঁঠা মারো আর এপারে ফেলে দাও, আমি একটু টেনে নিয়ে গিয়ে ওধারে জমিয়ে রাখি। শেষে দুজনে মিলে নিয়ে যাওয়া যাবে।

বাঘের তো আগে থেকে জিভে জল ঝরছিল, সে আর কোন কথা না বলে খোঁয়াড়ের ভেতর লাফিয়ে পড়ল। একটা পাঁঠা মেরে সে এপারে ফেলে দিল—এই নাও ভাগ্নে সরিয়ে রাখ।

শেয়াল মরা ছাগলটাকে টেনে টেনে বনের ভেতর নিয়ে এল। ওদিক থেকে বাঘ শেয়ালকে বলল—ও ভাগ্নে, ছাগলগুলো সব জেগে গেছে, বেজায় ছুটোছুটি করছে একটাকেও ধরতে পারছি না!

শেয়াল ততক্ষণে মরা ছাগলটার ল্যাজের দিক থেকে চিবুতে শুরু করেছে। সে বলল—মামা, তোমার ওই বীর গলায় একটা হুঙ্কার ছাড় না, ভয়েই ছাগলগুলো আধমরা হয়ে যাবে।

তাই না শুনে বাঘ মারল এক হুঙ্কার, পৃথিবী কেঁপে উঠল। সেই হুঙ্কারে চাষার দল জেগে উঠল।

বাঘ—বাঘ—বাঘ পড়েছে!

চাষার দল লাঠি সড়কি নিয়ে ধেয়ে এল। সকলে মিলে প্রাণ-পণে পিটতে শুরু করল বাঘকে। বাঘ একবার দাঁত বার করে খিঁচুনি দিতে গিয়েছিল, কে যেন একটা জলন্ত মশাল বাঘের মুখে গুঁজে দিল। বাঘ একেবারে চুপ। শেষে আধমরা হয়ে পড়ে রইল বেচারা।

এদিকে ধূর্ত শেয়াল মনের সুখে মরা পাঁঠাটাকে পেট ভরে ভোজন করে নিল। পাঁঠাটার ল্যাজের চুলগুলো পড়ে রইল শুধু। আহা, কতদিন এমন কচি পাঁঠা খাওয়া হয়নি! জিভ দিয়ে গোঁফটা চাটতে চাটতে সে ভাবল। ভোর হয়-হয়, দূরে খোঁয়াড়ের দিকে



চেয়ে সে দেখল, বাঘটা আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। শেয়াল করল কি, অমনি একেবারে হাত পা মেলে পড়ে গোঙাতে শুরু করে দিল।

বাঘ ভেবেছিল এসে শেয়ালকে লাগাবে তিন থাপ্পড়, যাতে সে নিজের নাম ভুলে গিয়ে মনে করে যে সে ইঁদুর ; কিন্তু তার অবস্থা দেখে জিগেস করল—ভাগ্নে, কী হল ?

শেয়াল কাৎরাতে কাৎরাতে জবাব দিল—ওঃ মামা! মেরে পিঠ একেবারে ভেঙে দিয়েছে, আর নড়তে পারছি না!

পাঁঠাটা কী হল ? বাঘ জিগেস করল।

আর বল কেন ? এই চাষাগুলো নিয়ে গেল!

বাঘ বলল—আর কী হবে ? প্রাণ নিয়ে বেঁচেছি এই ঢের! চল এখন ঘরে ফেরা যাক।

একপেট খেয়ে শেয়ালের আর হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না। সে তেমনি কাৎরাতে কাৎরাতে বলল—না মামা তুমি যাও, আমার আর চলবার ক্ষমতা নেই, আমি এইখানেই মরি তুমি যাও।

আরে, তাও কি হয় ? বাঘ জবাব দিল।

কী করব, এমন মার খেয়েছি যে আমার আর ওঠবার শক্তি নেই!

এক কাজ কর ভাগ্নে। তুমি আমার পিঠে উঠে পড়, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।

বাঘের পিঠে চড়ে বসল ধূর্ত শেয়াল। বাঘ তাকে পিঠে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যেতে যেতে বলল—অমন মুষড়ে যেও না ভাগ্নে! গিন্নি যা জোগাড় করে রেখেছে সেসব খেলেই আবার চাঙা হয়ে উঠবে।

পথে যেতে যেতে আগে পড়ে শেয়ালের গর্ত। সেই গর্তর কাছাকাছি আসতেই শেয়াল ঝাঁ করে বাঘের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে বলল—মামা, আজ আমার বড় পেট কামড়াচ্ছে, মামীকে বোলো আর-একদিন পাঁঠা জোগাড় করতে যাওয়া যাবে, মামীকে নিয়ে। সামান্য পাঁঠা জোগাড় করা কি তোমার মত বীরের সাজে ?

এই বলেই শেয়াল গর্তে ঢুকে গেল।

কাক-গিন্নির কপাল

বিস্তৃত মাঠের বৃক্ষছায়ার অন্তরাল থেকে ধ্বনি—কুউ কুউ কুউ! মধ্যাহ্ন-রোদে মাঠ উদাস, ঝিম-ঝিম। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে লাঠি কাঁধে পুঁটলি হাতে পথিক ধুয়ো ধরে সুর কেটে যায়—কুউ কুউ।

কোথায় কোন পত্রছায়ায় নিজেকে লুকিয়ে কোকিল সুতীব্র মধুর সাড়া দেয়—কুউ, কুউ উ, কুউ। কোকিলকে দেখা যায় না। সে এক অদৃশ্য পাখি। সে যেন শরীরী নয়, শুধু একটা ধ্বনি—কুউ কুউ কুউ।

বাসার কাঠিগুলো ঠিক করে বাগাতে বাগাতে কাকগিন্নি গর্জে ওঠে—দিনরাত খালি ডাক, খালি ডাক। কাজ নেই কম্ম নেই, বাসা বাঁধা নেই, ডিম-টিম, ছেলে-পুলে মানুষ করা নেই—খালি ডাক।

কর্তা-কাক—সাদা শার্টের ওপর কালো কোট পরা যেন—উড়ে এসে বেলগাছটার মাথায় বসে ঘাড় হেলিয়ে বলে, কঃ? কঃ? কী হল গো?

এই কোকিলগুলো! কাজ নেই কম্ম নেই, ডেকে ডেকেই গেল! আর, ডাকেরই বা কী শ্রী! তার চেয়ে কাকেদের ডাক কী মিষ্টি! কা, কা-আ – কা-আ!

কাক-গিন্নি ডেকে দেখিয়ে দেয়।

কর্তা মাথা নেড়ে সায় দেয়, ঠিক বলেছ গিন্নি—কোয়া, কোয়া, কোয়া।

কর্তা-গিন্নির সাড়া পেয়ে, আর কোকিলের বিরুদ্ধে প্রতি-যোগিতা হচ্ছে বুঝতে পেরে কোথা থেকে দলে দলে কাক চীৎকার

শুরু করে দেয়। কা কা ধ্বনিতে ভরে ওঠে আকাশ—যতক্ষণ না খোকার হাতের একটা ঢিল এসে থামায় তাদের গান।

খঃ খঃ করে কর্তা-কাক মাথা নেড়ে বলে, মানুষগুলো গানের কিছুই বোঝে না!

গিন্নি বলে, যাও দেখি, খড়কুটো নিয়ে এস! হতভাগা কোকিলগুলোর মত শুধু গান গেয়ে কাটিয়ে দিলে তো আমার চলবে না! এখন কত কাজ! ডিমে তা দিতে হচ্ছে, বাচ্চাদের মানুষ করতে হবে। কোকিলগুলোর কী করে কোথায় বাচ্চা হয় জানিনে বাপু!

কাকেদের কোকিলের খোঁজে দরকার কী গিন্নি? কর্তা কাক উড়ে যায়।

বেলগাছটার মাথায় কাক-গিন্নির বাসা বাঁধা শেষ হয়ে গেল। কাক-গিন্নির মনটা খুশিতে ভরা। ডিমগুলো এবার কেমন সবল, সতেজ হয়েছে! বাচ্চাদের মুখ দেখবার জন্যে কাক-গিন্নি উৎসুক।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাসাটা ছেড়ে অল্প দূরেই কাক-গিন্নি কিছু খাবারের সন্ধানে গিয়েছিল। দিনের বেলা গাছের মাথায় ডিমেদের আর কী ভয়? বাসাটা কিছুক্ষণের জন্য খালি। ঠিক সেই সন্ধ্যার ধূসর আবছায়ায় অদৃশ্য কালো একটা পাখি এসে নিঃশব্দে কাক-গিন্নির বাসায় বসল। কেটে গেল খানিকটা। লালচোখো পাখিটা অন্ধকারে মিশে গিয়ে সাবধানে আশপাশ লক্ষ্য করল কিছুক্ষণ, তারপরে নিঃশব্দে চোরের মত উড়ে গেল।

দিগন্তে ঘনিয়ে এল রক্তরাঙা সন্ধ্যার উদাস ছায়া। নিমীলিত সন্ধ্যা একবার কোকিলের তীব্র মধুর স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল—কুউ কুউ কুউ!

তার পরে মিলিয়ে গেল সে স্বর। কুলায়-ফেরা কাকেদের কর্কশ কলরবে অন্ধকার নেমে এল মাঠের বুকে।

জীবন কোনদিন নিঃশত্রু নয়। একদিন সেই বেলগাছটার মাথায় একটা লোককে দেখা গেল। তখন কাক-গিন্নির ডিমগুলো

প্রায় ফোটবার অবস্থায় এসেছে। লোকটাকে দেখে কাক-গিন্নি চীৎকার করতে করতে ছুটে এল—ক-আ? ক-আ?

চীৎকারে তার আকৃষ্ট হয়ে জুটে গেল বহু কাক। কাকেদের একতা দেখবার জিনিস। লোকটা হয়ত বেল পাড়তেই উঠেছিল, কিন্তু কাকেদের সেই অকারণ শত্রুতায় তার ঔৎসুক্য আকৃষ্ট হল বাসাটার দিকে। সে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল একটা ডিম। কাক-গিন্নি দিগ্বিদিক ভুলে সজোরে তেড়ে এসে মারল লোকটার হাতে একটা ঠোক্কর। সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা মাটিতে পড়ে থেঁতলে গেল। কাকেদের চীৎকারেই হোক বা অত্যাচারেই হোক, লোকটা আর কিছু না করে নেমে গেল। বেচারি কাক-গিন্নির কিন্তু চারটে ডিমের একটা গেল নষ্ট হয়ে। কিছুক্ষণ আর্তনাদ করে থেমে গেল কাক-গিন্নি। প্রাণীজগতে আর্তনাদ অর্থহীন।

তারপর একদিন ভোর রাতে দুটি শিশু-কাকের প্রথম ডাকে কাককুল কলরব করে উঠল। ভোর না-হতেই দলে দলে কাক দেখতে এল নতুন বাচ্চাদের। সার সার তারা বসে গেল বেলগাছের ডালটায়। রোঁয়াহীন মাংসপিণ্ড, হাঁ-করা বাচ্চাদুটোকে দেখে একটা বলল, বাঃ খাসা বাচ্চা হয়েছে।

ভারিক্কি-গোছের আর-একজন বলল, একটা ডিম তো এখনও ফোটেনি দেখছি। কাক-গিন্নি, ব্যাপার কী?

কাক-গিন্নি মমতাভরা গলায় বলল, ফুটবে আজ কাল, সময় তো চলে যায়নি!

ডিমটা যেদিন ফুটল, কাক-গিন্নি বাসায় ছিল না। বাচ্চাদের জন্ত খাবার জোগাড় করতে বাইরে যেতে হয়েছিল। তার এখন কত কাজ!

বাসায় ফিরতে ফিরতে সে শুনল বাসায় একটা শব্দ হচ্ছে—কুক্ কুক্! আর কর্তা-কাকের গলা শোনা যাচ্ছে কঃ কঃ?

গিন্নিকে দেখেই কর্তা জিজ্ঞেস করল, কঃ, গিন্নি কঃ? এ আবার কী রকম বাচ্চা?

কাক-গিন্নি চটে উঠল, বাচ্চার আবার রকম বে-রকম কী?

কর্তা বলল, দেখছ না, এ কি রকম ছোট, ঠোঁটটা লালচে, আর ও কী ডাকা—কুক্ কুক্! কাকের ছেলে জোর গলায় ডাকবে—ক আ—কা ক-আ!

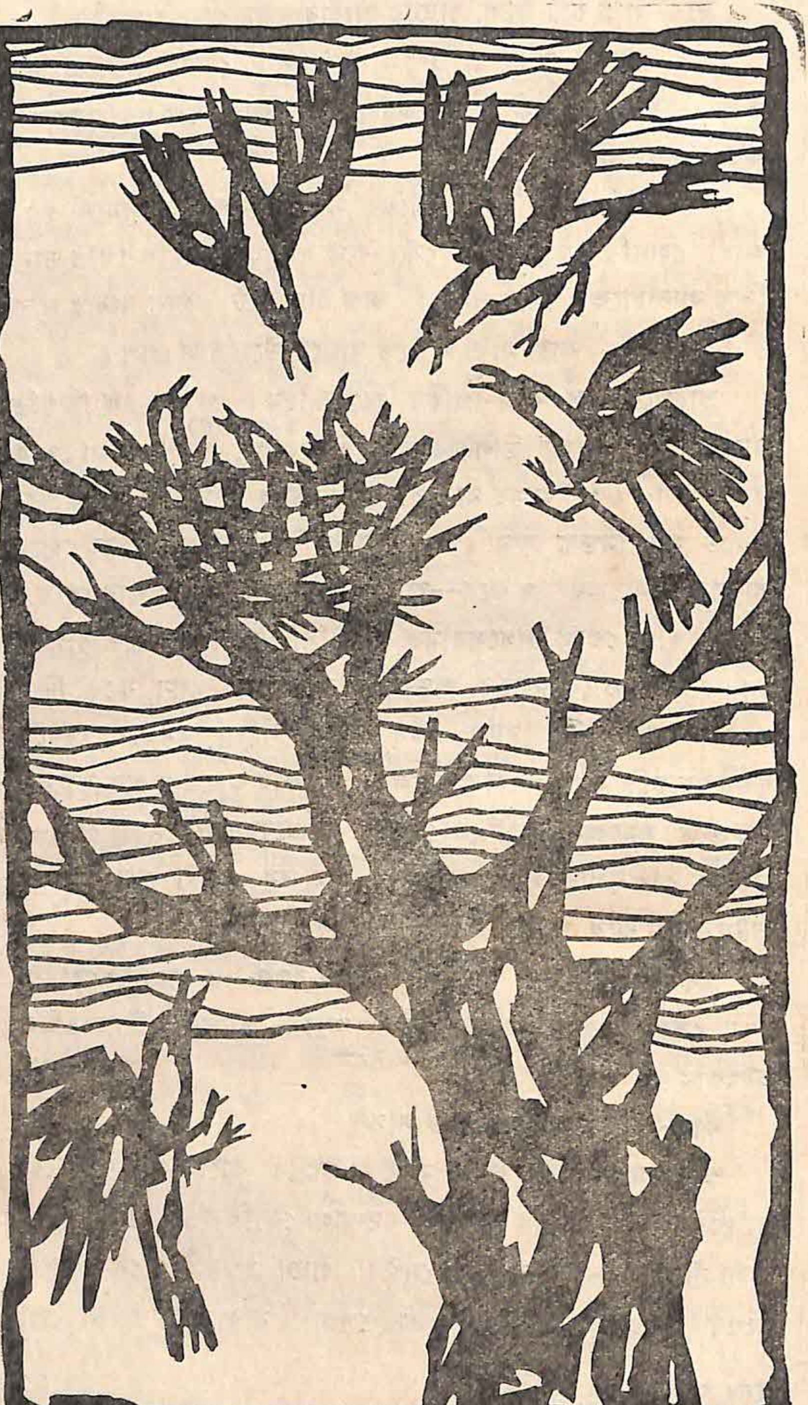
কাক-গিন্নি জবাব দিল, পায়ের সব আঙুল কি সমান হয়? আহা বেচারি ছেলেমানুষ, বেঁচে-বর্তে থাকুক! কাক-গিন্নি ডানা দিয়ে বাচ্চাটাকে আগলে বসল। অন্য বাচ্চাদুটো তখন খাবার জন্যে হাঁ-হাঁ করছে। কর্তা মাথা নাড়তে নাড়তে উড়ে চলে গেল।

তারপরে এল কাক-গিন্নির দুঃখের দিন। গভীর এক নিশুতি রাতে বাসার পাশের ডালটায় ঘুমোতে ঘুমোতে, একবার বাসা থেকে বাচ্চা-গলার একটা অদ্ভুত ঘঃ ঘর্‌র্ শব্দে চমকে উঠেছিল, কিন্তু পর-মুহূর্তে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কাক-গিন্নি ভাবল, ঘুমের ঘোরে বাচ্চারা নানারকম শব্দ করে—আহা ছেলেমানুষ তো হাজার হোক! কিন্তু সকালে জেগে পাগলের মত কাক-গিন্নি ডানা ঝাপটাতে লাগল। তার দুটো বাচ্চাকে রাতের অন্ধকারে কালপ্যাঁচা শেষ করে দিয়ে গেছে। হায় হায়, রাতে কেন সে জাগেনি! দেখতে দেখতে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল কাক মহলে। চীৎকার করতে করতে কাকের দল এসে সমবেদনা জানিয়ে গেল। কলরবের শেষে তারা বলল—কপাল, কাক-গিন্নি, সবই কপাল! যাক তবু একটা তো আছে। ওটাকে বড় করে তোল।

একজন সেই ছোট বাচ্চাটাকে দেখে বলল—এ বাচ্চাটা তোমার যেন কেমন কেমন, কাক-গিন্নি! আহা, আগের দুটি হয়েছিল চমৎকার!

কাক-গিন্নি ডানা ঝাপটাতে লাগল।

সুখে-দুঃখে কেটে চলল সময়। সময়ে কারো বা সুখ, কারো বা দুঃখ। কাক-গিন্নির মনে হল, হতভাগা কোকিলগুলোর সব সুখ। বাসা বাঁধা নেই—বাচ্চা পালা নেই। বাচ্চা হওয়াটাই যেন একটা দুঃখ। আহা, অমন বাচ্চাদুটি তার গেল। যাক, তবু একটা তো



আছে! কাক-গিন্নির সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়ল ওই ক্ষুদে বাচ্চাটার ওপর। কিন্তু সত্যি-সত্যিই বাচ্চাটা যেন কেমন কেমন! বিশেষ বড়ও হল না। আর বয়স তো প্রায় হল, এখনো কা বলতে শিখল না। আর খাওয়া-দাওয়ারও ওর বেজায় বাছ-বিচার। কাকদের খাওয়া-দাওয়ায় এত বিচার হলে কি চলে? কাকেরা যা পায় তাই খায়। কাঁচা পচার বাছ-বিচার তাদের নেই, একটা হলেই হল। বাচ্চাটা যেন ছিষ্টিছাড়া! ওর মনের মত খাদ্য জোগাতে বেচারি কাক-গিন্নির প্রাণান্ত।

এদিকে সেই ছোট্ট বাচ্চাটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ নধর, তপ্তকৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল। কাকেদের মত শরীরটা অত বড় হল না বটে, এবং বুকের সেই পাঁশুটে সাদা রংটাও সে পায়নি; কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যবান। সারা দেহটা তার কাকেদের চেয়েও কুচকুচে কালো, ঠোঁটটা লাল—সেটাও কাক-গিন্নির একটা বিস্ময়। তারপরে ডানা তার একদিন পূর্ণ হয়ে উঠল। লাফিয়ে লাফিয়ে সে বাইরে যেতে চায়।

কাক-গিন্নি তাকে শেখাতে চেষ্টা করে, বল তো খোকা—কা! বল কা-আ! বল, বল, আচ্ছা—কঃ! ধ্যেৎ তেরি!

ছেলেটা বোবা হবে নাকি?

কাকের খোকা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সেদিন সকালটা সোনালি উজ্জ্বল। সমস্ত আকাশ থেকে যেন গলানো সোনা ঝরে ঝরে পড়ছে। একটা শিথিল প্রাণের উত্তাপে প্রকৃতি স্পন্দমান। মাথার ওপর একটা বৌ-কথা-কও হেঁকে হেঁকে চলে গেল। কাক-গিন্নি সমস্ত কাকেদের নেমন্তন্ন করেছে—বাচ্চা তার সেদিন উড়তে শিখবে।

তার বাচ্চাকে কাক-গিন্নি অত ভালবাসে, কিন্তু বাচ্চাটা মায়ের ওপর বিরূপ। কাক-গিন্নির কোন কথা সে শুনতে চায় না, শুধু খাওয়া ছাড়া। অবাধ্য বাচ্চাটাকে ঠেলেঠুলে বাসার বাইরে নিয়ে এল কাক-গিন্নি, বলল, নে ওড়! এমনি করে ডানা মেলে দে!

বাচ্চার কিন্তু ওড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। সে অবাক হয়ে সুদূর দিগন্তের পানে তাকিয়ে ছিল—যেন তার চোখে কী এক স্বপ্ন! কাক-গিন্নি হঠাৎ তাকে মারল এক ঠেলা। বাচ্চাটা ঠেলা খেয়ে শূন্যে পড়ে গেল, আর পড়তে পড়তে ডানা দিল মেলে।

কাকেরা সমস্বরে বলে উঠল—কাঃ কাঃ! বাঃ বাঃ! কাক-গিন্নি ডাক দিল, কাঃ! বেশ হয়েছে, এবার এদিকে ফের।

বাচ্চার কিন্তু ফেরবার লক্ষণ দেখা গেল না। উড়ন্ত অবস্থায় সজোরে পত পত করে সে একবার ডানা নেড়ে নিল। কালো দেহ তার সূর্যকিরণে ঝকঝক করে উঠল। পূর্বদিগন্তের পানে বাচ্চাটা মুখ ফেরাল।

কাক-গিন্নি চেঁচিয়ে উঠল ক্বঃ? ক্বঃ? কী হচ্ছে ফের!

আর হঠাৎ তার বোবা বাচ্চা এতদিনে গলা ছেড়ে ডেকে উঠল—কুউ! কুউ! কুউ!

পুবের আলোর পানে একটা তীরের মত উড়ে চলল সে। নবীন ডানায় তুরন্ত আকাশের ইসারা লেগেছে। নবীন, সতেজ, তীব্র-মধুর স্বরে পৃথিবী জীবন্ত হয়ে উঠল—কুউ! কুউ! কুউ! কুউ! কাক-গিন্নির সঙ্গে কাকের দল হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল তার পথে।

———

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার

৮৭তম

গ্রন্থ